প্রকল্প শিরোনামঃ **মঙ্গা প্রতিরোধে গণগবেষণা**

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মঙ্গা প্রতিরোধে গণগবেষণা একটি ভিন্নধর্মী গবেষণা। এই গবেষণায় সবচেয়ে গুর"ত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের যারা যুগ যুগ ধরে অভাব মঙ্গার সাথে সংগ্রাম করে টিকে আছেন, নির্মমভাবে উপেক্ষিত হয়েও দেশ জনের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। ভাসা ভাসা কথায় নয় দিনের পর দিন গভীরভাবে চিন্ড্র করে প্রকৃত পক্ষেই মঙ্গা ঠেকানোর জন্য বাস্ড্রবসম্মত মতামত দিয়েছেন, দিয়েছেন অনেক জর"রী তথ্য। সেজন্য অংশগ্রহণকারী গণগবেষকদের নিকট আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। এ গবেষণায় স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী যুবক-যুবতীরা প্রচুর পরিশ্রম করে সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা, স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বার ও সুধী জনদের, যারা এই গবেষণায় পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) কে, যাদের আন্ড্ররিক সহযোগিতায় গবেষণার একাজটি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। কাজটি সম্পন্ন করার জন্য আমার সহকর্মী এনিমেটর শারমিন রিনা ও আনার"ল রিপন রাতদিন পরিশ্রম করে সহযোগিতা করেছেন সেজন্য আমি তাদের নিকট গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

ভূমিকা

বছরের একটি বিশেষ সময় উত্তরবঙ্গে মঙ্গা হয় প্রতি বছরই। এ সময় কৃষি শ্রমিকদের হাতে কাজ থাকে না ফলে হাতে থাকে না টাকা। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় ক্ষমতার নাগালের বাইরে চলে যায়। অসহায় হয়ে পড়ে শ্রমজীবি মানুষেরা। অভাবে পড়ে না খেয়ে, কম খেয়ে, একবেলা খেয়ে কষ্ট করে দিন কাটাতে হয়। অভাবের তাড়নায় চেয়ে খাওয়া, ধার-কর্জ করা সবই চলে। জীবন বাঁচানোর জন্য হাতের নাগালে যা সংগ্রহ করা যায় এরকম শাক-পাতা, কচু কোন মত সিদ্ধ করে খেয়ে থাকেন। সেজন্য ডায়রিয়া, পেটের পীড়াসহ নানা রকম রোগ ছড়িয়ে পড়ে। আর সারা বছরের চেষ্টায় গোছানো কিছু সম্পদ পানির দামে বিক্রি করতে হয়। তাহা ছাড়াও ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে মহাজনের নিকট। কোন কোন বছর মঙ্গা বেশি ভয়াবহ রূপ গ্রহণ করে। এবার (গত অক্টোবর'০৪) মঙ্গায় না খেয়ে জলঢাকা উপজেলার আসকার আলী নামে একজন শ্রমজীবির মৃতু খবর জাতীয় কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশ হলে তা নিয়ে হৈ চৈ সৃষ্টি হয়। জেলা প্রশাসকের পক্ষ হতে বলা হয় 'না খেয়ে নয়' আসকার আলী হার্টফেল করে মারা গেছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পক্ষে-বিপক্ষে অনেকেই মতামত বলেছেন। আসকার আলীর মৃত্যু যে কারণেই হোক, মঙ্গা যে প্রতি বছর হয় এবং সে মঙ্গার ফলে শ্রমজীবিরা কষ্টের মধ্যে জীবন কাটান, সে কথা সবাই স্বীকার করেন এবং বিষয়টি নিয়ে কিছু একটা করার ব্যাপারে সকল পর্যায়েই একটা তাগিদ সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের পক্ষ হতে বলা হয়েছে মঙ্গা ঠেকানোর ব্যাপারে কোন পরামর্শ থাকলে জানানোর জন্য। এর উত্তরে সাদা মাটা পরামর্শ অনেকেই বলছেন। যেমন, কাজ সৃষ্টি করতে হবে, হাঁস, মুরগী, গর", ছাগল পুষতে হবে, কৃষিতে উৎপাদন বাড়াতে হবে, কল-কারখানা বানাতে হবে, এরকম আরও অনেক ধরনের সমাধান। কিন্তু এ সকল সোজা-সাপটা সমাধানে তেমন কাজ হয় না। তা যদি হতো তাহলে এ সমস্যা আগেই সমাধান হয়ে যেতো। দরকার বাস্ড্রবসম্মত একটা সমাধান। সে সমাধানের জন্য প্রধানত নির্ভর করতে হবে ভূক্তভোগীদের উপর। যারা মঙ্গার কঠিন পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করে যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকছেন, টিকে থাকছেন, নিশ্চয় টিকে থাকা ও এ অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য যে জ্ঞান দরকার সে বিষয়ে তারাই বেশি জানেন। সেজন্য গত অক্টোবর মাসে 'মঙ্গা' প্রতিরোধের বিষয়ে ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর লোকদের গবেষণা করার সহযোগিতা করতে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (রিইব) কে প্রস্ড়াব দিলে তারা সে প্রস্ড়াব গ্রহণ করেন। সে প্রস্ড়াব অনুযায়ী এই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় মূল গবেষক হিসাবে ভূমিকা পালন করেছেন সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির ১৬৯ জন নারী ও ২৭ জন পুর"ষ।

গবেষণার বিষয়

মঙ্গা আসার প্রকৃত কারণ ও প্রতিরোধের উপায় খুঁজে বের করা এবং কার্যকর করার প্রস্ড়াবনা তৈরী করা।

গবেষণার উদ্দেশ্য

মঙ্গা প্রতিরোধে একটি বাস্ড়বসম্মত কৌশল উদ্ভাবন করা। সে কৌশলের ব্যবহারে সমগ্র উত্তরাঞ্চলে মঙ্গা প্রতিরোধ করা সম্ভব হতে পারে।

গবেষণার এলাকা

নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার কাঠালী ইউনিয়নের দক্ষিণ দেশীবাই গ্রাম ও খুটামারা ইউনিয়নের করলাবেচাটারী। এলাকাটি পুরোপুরি কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। মাত্র কয়েক ঘর লোক আছেন যারা গৃহস্থ। তাছাড়া আর প্রায় সবাই দিন মজুর। কিছু লোক ভ্যান, রিকসা চালান, আছে কিছু ছোট ব্যবসায়ীও। এলাকায় কাজ না থাকলে পুর"ষ মজুররা জেলার বাইরে কাজের সন্ধানে চলে যান। কেউ কেউ ঢাকা, সিলেট যেয়ে রিকসা চালানোর কাজও করেন। নারীরা এখানে দিন মজুরী করেন। সাধারণতঃ মৌসুমের সময় নারীরা দিন মজুরীর কাজ করেন। তবে তাদের মজুরী পুর"ষের তুলনায় প্রায় অর্ধেক।
পত্রিকার খবরে প্রকাশিত মঙ্গায় না খেয়ে মারা যাওয়া আসকার আলীর বাড়ী গবেষণা এলাকার মধ্যেই।

গবেষণার সময়কালঃ ৩ (তিন) মাস

এনিমেটর নিয়োগ

গণগবেষণার কাজটিতে সহায়তা করার জন্য নীলফামারী সদর উপজেলার এনিমেটর গড়ে তোলা প্রকল্প হতে ২ জন (একজন নারী ও একজন পুর"ষ) দক্ষ এনিমেটরকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তারা যথাসময়ে এলাকায় যেয়ে অবস্থান করেন। থাকার ক্ষেত্রে প্রথম মাসে বাড়ী ভাড়া করে থাকলেও একমাসের মধ্যেই গণগবেষকরা উদ্যোগ নিয়ে দু'জন এনিমেটরকেই তাদের পাড়ার মধ্যে একটু স্বচ্ছল পরিবারের সাথে বিনা ভাড়ায় থাকার ব্যবস্থা করেন।

গণগবেষণার দল গঠন

বাড়ীতে যেয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে এনিমেটররা ১৫ দিনের মধ্যে করলাবেচাটারী ও দক্ষিণ দেশীবাই এই দুটি পাড়ায় ৪টি নারী দল গঠন করেন এবং তারা গণগবেষণা শুর" করেন। পুর"ষদের সাথে ব্যক্তিগত আলোচনা করেও দল গঠন সম্ভব হয়নি। তারা বসার জন্য সময় নির্ধারণ করলেও সে সময় দেখা যাচ্ছে তারা উপস্থিত হয়নি। কারণ হিসাবে তারা বলছেন কাজের জন্য গবেষণা করার সময় নেই। খোঁজ করে দেখা যাচ্ছে দিনের বেলায় পুর"ষরা ব্যস্ড় থাকছেন কাজে। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে বাজারে যান। বাজার করার জন্য সময় তেমন লাগে না কিন্তু গৃহস্ড়দের নিকট হতে মজুরীর টাকা পেতে বেশ দেরি হয়। গৃহস্ড়রা তার নিজের খরচের সকল কাজ শেষে মজুরকে টাকা দেন। সে সময় টাকা কম পড়লে মজুরীর টাকা আংশিক বাঁকীও থাকে। বিলম্বে মজুরী পাওয়াটা বাজারে দেরি হওয়ার একটা বড় কারণ। তাছাড়া দেরি হওয়ার অন্য একটি কারণ আছে তাহলো বাজারে VCD তে হোটেলে ছবি দেখানো হয় গভীর রাত পর্যন্ড়। ছবি দেখার জন্য সরাসরি কোন টাকা লাগে না তবে হোটেলে ঢুকলে পাঁচ টাকা পরিমানের কিছু না কিছু খেতে হয়। এভাবে গভীর রাত পর্যন্ড় ছবি দেখে বাড়ী ফেরেন অধিকাংশ পুর"ষরা, ফলে তাদের গবেষণা করার সময় নেই। গবেষণা করে তাদের কোন সুবিধা হতে পারে এরকম আস্থাও তাদের কম। তারা প্রথমেই জানতে চান গবেষণা করে টাকা পয়সা বা কিছু পাওয়া যাবে কী না। সরাসরি কিছু না পাওয়ার কথা শুনে হতাশ হন। সেজন্য শেষ পর্যন্ড় পুর"ষদের মধ্যে গবেষণা দল গঠন করা সম্ভব হয়নি। তবে ব্যক্তিগতভাবে ২/৩ জন মিলে মঙ্গা বিষয়ে মতবিনিময় হয়েছে ২৭ জন সুবিধাবঞ্চিত পুর"ষের সাথে।

গণগবেষণার দল সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট স্থানে ১/২ ঘন্টার জন্য বসেছে। গবেষণার সিডিউল নীচের টেবিলে দেখানো হলো-

বার	গবেষণা যে বাড়ীতে বসে তার নাম	স্বামীর নাম	পাড়া	গ্রাম	সময়	ইউনিয়ন	শুর"র তারিখ	গবেষকের সংখ্যা
রবি	মঞ্জিলা বেগম	আবতাব আলী	করলাবেচা টারী	পঃ খুটামারা	সকাল১০ টা	খুটামারা	১৮/১১/০৪	৫২ জন
সোম	জবেদা বেগম	ফজলার রহমান	ডাঙ্গাপাড়া	দঃ দেশীবাই	ঐ	কাঠালী	৮/১১/০৪	৩৭ জন
মঙ্গল	আয়মেনা বেগম	শামসুল	করলাবেচা টারী	পঃ খুটামারা	ঐ	খুটামারা	২৩/১১/০৪	৩১ জন
বুধ	হামিদা বেগম	সামসুদ্দিন	ডাঙ্গাপাড়া	দঃ দেশীবাই	ঐ	কাঠালী	৪/১১/০৪	৪৯ জন

নারীদের মধ্যেও প্রথম দল গঠনের সময় ব্যাপক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে এনিমেটরদের। প্রথমদিকে সবাই ভাবতেন নিশ্চয় এরা সরকারী গোয়েন্দা। আসকার আলীর মৃত্যুর পর সৃষ্ট পরিস্থিতিতে কোন তদন্ড় করতে এসেছে। এ কারণে অনেকে কথা বলতে ভয় পেয়েছেন। কেউ ভেবেছেন খৃষ্টান করতে এসেছে। সে জন্য কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছেন এনিমেটরদের তারা নামাজ পড়ে কী না। কয়েক দিনের মধ্যেই আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে সবার মন থেকে বিভিন্ন আশংকা দূর হতে থাকে। তারা ক্রমেই গবেষণার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। আগ্রহী হওয়ার প্রথম কারণ হিসাবে তারা বলেন, আমরা অনেক কিছু শিখতে পারছি। আগে কখনও এরকম চিন্ড়া-ভাবনা করিনি। তবে এরকম কিছু অংশগ্রহণকারী আছেন যারা ভাবছেন পরে যদি কোন সুবিধা পাওয়া যায় সেরকম চিন্ড়া থেকেও গবেষণা দলে থেকেছেন।

নারীরা অধিক আগ্রহী হওয়ার কারণ হিসাবে প্রথমতঃ আমার মনে হয়েছে, বহু ধরণের সুবিধাবঞ্চনার মধ্যেও সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নে পুর"ষরা কিছু সুবিধা ভোগ করে থাকেন, কিন্তু নারীরা সামাজিক মর্যাদা থেকে অধিক বঞ্চিত। গবেষণার দলে বসে অনুভব করছেন যে তাদেরও মর্যাদা আছে। আর তাদের ভাবনা ও মতামতেরও যে মূল্য আছে এটা তারা আগে কখনও ভাবেননি। দ্বিতীয়তঃ নারীরা বেশিরভাগ সময় বাড়ীকেন্দ্রিক অবস্থান করেন। এজন্য তারা সহজেই বৈঠকে বসতে পারেন। তৃতীয়তঃ গণগবেষণার পদ্ধতিটা এমন যেখানে সকল সদস্য সাবলিলভাবে অংগ্রহণ করতে পারেন। অবশ্য এ কারণটি পুর"ষদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

গবেষণা শুর"

দল গঠনের পর সকলে মিলে শুর" হলো গবেষণা। গণগবেষণার শর"তে এনিমেটরের সহযিাগিতায় গবেষকদের সামনে প্রথম প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, মঙ্গা কী?

এ বিষয়ে সবাই কথা বলেছেন। সবার মতামতের সারসংক্ষেপ করলে দাঁড়ায়

– যে জিনিসটি পাওয়া যায় না বা দাম বেশি তাকেই মঙ্গা বলে।

– কোন কিছু ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেলে তাকে মঙ্গা বলে।

– কোন কিছুর বেশি অভাব দেখা দিলে তাকে মঙ্গা বলে।

মঙ্গা বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় সুধীমহলের কেউ কেউ বলেন, মাঙ্গা থেকে মঙ্গা কথার উৎপত্তি। কেউ কেউ মঙ্গাকে আকাল বলেছেন।

মঙ্গার সময়কাল

গবেষকরা বলছেন, আমাদের তো বার মাসই মঙ্গা। তারপরও কমবেশি আছে। ভাদ্রের শেষের দিক হতে আশ্বিন, কার্তিক এই দু আড়াই মাস হয় কঠিন মঙ্গা। আমন ধান উঠার আগের সময়টা খুবই মঙ্গা হয়।

কোন কোন জিনিস পত্রের মঙ্গা সাধারণতঃ হয়ে থাকে?

এ প্রশ্নে সব দল হতে যে সব উত্তর এসেছে তা হলো- চাল, আলু, মরিচ, পিয়াজ, রসুন, লবন, তেল, সাবান, ধান, শাক-সবজি, সার ইত্যাদি।

মঙ্গার সময় কী পরিস্থিতি হয় বা কেমন করে তারা মঙ্গার মধ্যে টিকে থাকেন

এ বিষয়ে সবাই তাদের মর্মান্ড়িক কষ্টের বিবরণ দিয়েছেন। মঙ্গার সময় কাজ থাকে না তাই হাতে একটা পয়সা থাকে না। তখন অন্যের কাছে হাত পাতলেও কেউ কিছু দিতে চায় না। খাবার যোগাড় করা খুবই কঠিন হয়ে যায়। যা যোগাড় করা যায় তা থেকে দিনে একবারও ভরা পেটে ভাত খাওয়া সম্ভব হয় না। পরিবারে যেখানে ২ কেজি চাল লাগে সেখানে কোনমতে যোগাড় করা সম্ভব হয়েছে ১ কেজি। তখন ১ কেজি চাল রান্না করে পানি দিয়ে সবাইমিলে খাওয়ার পর্ব শেষ করেন। সারাদিনে যেখানে তিনবার খাওয়ার কথা, সেখানে একবার খেতে হয় সেজন্য সারাদিন কোন রান্না না করে শেষ বিকালে একবার রান্না করে খেয়ে থাকেন, যাতে রাত্রে আর খাওয়ার প্রয়োজন না হয়। কোন কোন দিন কাজ পেলেও টাকা পাওয়া যায় কম ফলে সে টাকায় চাল আটা কিছুই কেনা যায় না তখন কম দামে ভুষিসহ আটা কিনে লবন পানি দিয়ে ফ্যান বানিয়ে খেতে হয়। আবার এমনও ঘটে যে, কাজ করার পর গৃহস্থ বাজারে অনেক সময় ধরে ঘুরিয়ে শেষে বলে দিল আজ টাকা দেওয়া যাচ্ছে না, পরে দিব। গৃহস্থকে বার বার বলেও তার মন গলানো সম্ভব হয় না। এরকম পরিস্থিতিতে ছেলে-মেয়ের কথা চিন্ড়া করে পাঁচ জায়গায় হাত পেতে হয়তো এক জায়গা হতে কিছু টাকা বা চাল কর্জ পাওয়া গেল তাই দিয়ে কোনরকমে দিনটা চালিয়ে নিতে হয়। কোন কোন দিন কাম মিলে না খাবারও মিলে না। তখন কদু (লাউ), কচুর মুতা সিদ্ধ করে খেতে হয়। শুধু কচুর পাতার পেলকা (কচুর পাতা ও অন্যান্য শাকের সাথে সোডা দিয়ে রান্না করা তরকারী) খেয়ে বুক জ্বলে ও পেট ব্যাথা করে। শুধু মাত্র একটি আলু খেয়ে কাটাতে হয়েছে কোন কোন দিন, সেরকমটি ঘটেছে অনেকবার বলে জানালেন, ডাঙ্গা পাড়ার হাজেরা বেগমসহ অনেকেই। ধৌলি বেগম বললেন, একবার শুধু আলু খেয়ে বমি করতে করতে অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। তখন তার মা খবর পেয়ে কলার পাতায় কিছু ভাত নিয়ে এসে তাকে খাওয়াইয়া জীবন বাঁচিয়েছিল। এ সময় ছোটদের কষ্ট হয় সবচেয়ে বেশি। বড়রা যেভাবে ক্ষুধা সইতে পারে ছোটরা তা পারে না। তাই নিজে না খেয়ে ছোটদের খাওয়াতে হয়। তারা বলছেন ক্ষুধার কষ্টের সময় পেটে কাপড় বেধে অনেক সময় বসে, শুয়ে কাটান। ছোটদের কষ্টের কথা বর্ণনা দিতে যেয়ে একজন গবেষক বললেন, ‘‘মঙ্গার সময় ছাওয়া ছোটগুলা যেন নালানুট (ছটফট) করে বেড়ায়। এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে পুর“ষরা অনেক সময় কাজের জন্য বাইরে চলে যান তখন ছোট শিশুদের নিয়ে সংসার চালানোর দায়িত্ব নারীরাই পালন করে থাকেন। তখন অনেক নারী কিছু আর্থিক সহযোগিতার আশায় বাবা বা ভাইয়ের বাড়ী যান। অনেক স্বামী স্ত্রীদের বাবার বাড়ী হতে কিছু নিয়ে আসার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন এমনকি মারপিটও করেন। এমনও ঘটে স্ত্রী স্বামীর অত্যাচারে বাবার বাড়ী যাচ্ছেন কিছু সহযোগিতার আশায় কিন্তু সেখানেও সহযোগিতা চাওয়ায় ঝগড়া বেধে যায়। সেখানেও ঘটে অনেক অপমানের ঘটনা। তারা বলছেন, এত অপমান সহ্য করেও উপায় না পেয়ে বাবা-ভাইয়ের কাছে ছুটে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। এ নিয়ে অনেক বিবাদও হয়। অনেক আশা নিয়ে গেলেও কম সংখ্যকই সহযোগিতা পেয়ে থাকেন।

তারা বলছেন, ক্ষুধার জ্বালায় কান্ড জ্ঞান হারিয়ে যায়। অনেকের কাছে হাত পাততে হয় মান সম্মানের দিকে না তাকিয়ে। শাক পাতা যা পাওয়া যায় তাই যোগাড় করে কোন রকমে খেয়ে বাঁচার চেষ্টা করেন। কিছু খাবার যোগাড় করা গেলেও লবন ঝাল ঠিকমত না দিয়েই খেতে হয়। দেখা যায় এসময় প্রায় লোকেরই পেটে অসুখ হয়। শিশুদের অসুখ হয় বেশি। মঙ্গার সময় অসুস্থ্যতায় কষ্ট বাড়ে আরও বেশি। কোন বছর চেয়ারম্যান, মেম্বর ও এজিওরা রিলিফ দেয়। কিন্তু তা সবাই পায় না। প্রায় সবাই বলেন, তারা রিলিফ পাননি। প্রতি বছরেই লক্ষ্য করা যায় এসব এলাকায় ডায়রিয়া ছড়িয়ে পড়েছে। ডায়রিয়া হওয়ার প্রধান কারণ হিসাবে স্থানীয় একজন চিকিৎসক বলেছেন, গরীব মানুষেরা সারা বছরই অপুষ্টিতে ভোগেন। ফলে

তাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কম থাকে। মঙ্গার সময় তারা স্বাস্থ্যসম্মত নয় এমন খাবারও বাধ্য হয়ে খেয়ে দ্র“তই অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। বিশেষ করে এ সময় ডায়রিয়া, আমাশা ও নানা ধরনের পেটের পীড়া দেখা দেয়। শিশুরা আক্রান্ড় হয় দ্র“ত এবং সংখ্যায় বেশি। কোন কোন বছরে মারা যাওয়ার ঘটনাও ঘটে।

এ সময় জীবন বাঁচানোর জন্য হাঁস, মুরগী , ছাগল, গর“, গাছ, চৌকি, ঘরে থাকা কাসা, রূপা, পিতলের জিনিসপত্র কম দামে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। এসব জিনিসপত্রের মধ্যে এমন অনেককিছু থাকে যেগুলো প্রচুর কষ্ট করে ছেলে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার আশায় প্রস্তুত করেন। অনেকে তাদের সামান্য জমি এমনকি বসত ভিটার জমিটুকুও বিক্রি করেন। জমি বন্ধক রাখেন, ধান কাটার মৌসুমের আগেই মজুরী অগ্রীম নেন (মৌসুমের সময় এক বিঘা জমির ধান কাটার মুজরী ১৫০ টাকা কিন্তু অগ্রীম নেন মাত্র ৮০ টাকায় কেটে দেওয়ার শর্তে)। মহাজনের নিকট হতে ধানের উপর টাকা নেন মন প্রতি ১৫০ টাকায় মৌসুমে এক মন ধান দেওয়ার শর্তে। ধান উঠলে ধানের দাম হয় সাধারণত ৪০০ টাকা। এ সময় অনেকেই NGO এর নিকট ঋণ নিয়ে থাকেন। মঙ্গার সময় জীবন বাঁচাতে এমনভাবে ঋণী হয়ে পড়েন তারা যে মঙ্গা পরবর্তীতে মৌসুমী কাজের বাড়তি আয় ঋণ পরিশোধ করতে চলে যায়। যার ফলে কাজ শেষ হওয়ার পর আবারও প্রচন্ড অভাবে পড়েন তারা।

মঙ্গার এই কঠিন দিনে অবস্থাপন্ন ঘরের দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা অভাবের সুযোগ নিয়ে সাহায্যের অজুহাতে কোন কোন পরিবারে নারীদের ভোগ করার সুযোগ গ্রহণ করে থাকে বলেও গবেষকরা মতামত দিয়েছেন। গবেষকদের সাথে ব্যক্তিগত আলোচনায় জানা গেছে, একটি পরিবার এখন গোপনে দেহ ব্যবসাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে। আর্থিক দিক দিয়ে তারা কিছুটা ভাল আছে কিন্তু সামাজিকভাবে তাদের কোন মর্যাদা নেই। কেউ তাদের সম্মান দেয় না। পরিবারের কর্ত্রী একান্ড় সাক্ষাৎকারে তার কষ্টের কথা বলেছেন, কেমন করে মঙ্গায় পড়ে তাদের এবস্থা হলো তার বিবরণ দিয়েছেন। সামাজিক সম্মান না পাওয়ার দুঃখ পরিবারের সদস্যরা উপলব্ধি করতে পারেন এবং এ ধরনের কাজকে তারা নিজেরাও অন্যায় মনে করেন।

কাঠালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ গোলাম রব্বানী জানালেন, আগের চেয়ে এখন মঙ্গায় কষ্ট হয় বেশি। তার কারণ হিসাবে তিনি বলেন, আগে মানুষ চাইলে কেউ না কেউ কিছু দিত কিন্তু এখন কেউ কাউকে সাহায্য করে না। ফলে তার কষ্ট আরও বেশি হয়। মঙ্গা ঠেকানোর ব্যাপারে তিনি বলেন, সরকার সঠিকভাবে পরিকল্পনা নিলে ঠেকানো যেত। এ ব্যাপারে আমাদের মতামত কেউ গ্রহণ করে না। তিনি এনজিও দের সুদের ব্যবসাকেও মঙ্গা হওয়ার কারণ বলে মনে করেন।

মঙ্গার সময় কষ্ট বিষয়ে আলোচনা করতে যেয়ে ১০/১২ বছর আগের কথা মনে করে গবেষকরা বলছেন, তখন মঙ্গায় যত কষ্ট করেছি এখন তত কষ্ট করতে হয় না। এর কারণ হিসাবে তারা বলেন, আগে হাজার কষ্ট হলেও স্বামীরা এলাকাতেই কাজ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। কাজ না পাইলে বসে থেকে কষ্ট করেছেন। কিন্তু এখন ঢাকা, কুমিল-া, সিলেটসহ অন্যান্য শহরে রিকশা চালানো বা অন্যান্য কাজ করার জন্য পুর“ষরা চলে যাচ্ছেন। এলাকায় কাজ না থাকার সময়টা বাইরে কাজ করে চলছেন। এর ফলে আগের তুলনায় কিছু হলেও কষ্ট কমেছে। অবশ্য এর পাশাপাশি অন্য কথাও বলছেন। যেমন আগে যেখানে সেখানে শাক-পাতা সংগ্রহ করা যেত কিন্তু এখন সর্বত্রই আবাদ হচ্ছে ফলে শাক-পাতাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তারা আরও বলছেন, এখন আমাদের কাপড়-চোপড় ও বেশ-ভুসা ভাল হয়েছে কিন্তু কষ্ট বেড়েছে। পেট কে দেখে, সেই জন্য না খেয়ে কাপড়-চোপড় কিনে বাইরে ঠিক রাখছি। তারা বলেন, মঙ্গায় পড়ে যত কষ্ট হয় তা লজ্জায় বলা যায় না। কোন কোন স্বামী জুয়া খেলে অথবা বসে থাকে। সে সময় স্ত্রী গৃহস্থের বাড়ীতে কাজ করে সারাদিন পরে কিছু খাবার ও আধা কেজি চাল নিয়ে বাড়ী আসেন। তা দিয়েই স্বামী সন্ড়নসহ খেয়ে কোনমতে চলেন। যেদিন এ কাজটুকুও না পাওয় যায় সেদিন না খেয়েই কাটাতে হয় সবাইকে।

মঙ্গা হওয়ার কারণ সমূহ

বিভিন্ন গবেষক দল মঙ্গা হওয়ার যে সকল কারণের কথা বলেছেন তা সংক্ষেপ করে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

১। কাজ না থাকা ২। ঋণ করা ৩। ধানের উপর টাকা নেওয়া ৪। অলসতা ৫। নিজের দোষ ৬। ঝগড়া করা ৭। হিংসা করা ৮। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিল না থাকা ৯। আগাম মজুরীর উপর টাকা নেওয়া ১০। সঞ্চয় না থাকা ১১। যৌতুক দেওয়া ১২। অসচেতনতা ১৩। ন্যায় বিচার না পাওয়া ১৪। জুয়া খেলা ১৫। কুসংস্কার ১৬। বয়স্ক ভাতা ও ভিজিডি কার্ডের জন্য ঘুষ দেওয়া ১৭। আবাদ করতে না পারা ১৮। বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান চর্চা না করা ১৯। নারীরা বাইরে কাজ না করা ২০। ভাগ্যের উপর নির্ভর করা ২১। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ২২। মহাজনের দোষ ২৩। জমি বিক্রি করা ২৪। বহুবিবাহ ২৫। সিজেন মত আবাদ না করা ২৬। পরনির্ভশীলতা ২৭। ধানে কারেন্ট পোকা ধরা ২৮। অহংকারী হওয়া ২৯। জনসংখ্যা বেশি হওয়া ৩০। মামলায় পড়া ৩১। প্রতিবেশীদের মধ্যে মিল না থাকা ৩২। কোন কাজে সঠিক তথ্য না জানা ৩৩। সরকারের দোষ ৩৪। জোর যার মুল-ুক তার এ রকম সন্ত্রাস হওয়ার কারণে ৩৫। দেশের মাল বিদেশে চলে যাওয়ায় ৩৬। বিদেশী মাল দেশে না আসা ৩৭। হরতাল ৩৮। অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকা ৩৯। বাল্য বিবাহ ৪০। পরিবারের সবার মধ্যে মিল না থাকা

মঙ্গার কারণের বিশে- ষণ

প্রাথমিক আলোচনায় মঙ্গার যে সকল কারণ গবেষকরা চিহ্নিত করেছেন সে সকল কারণকে ভেঙ্গে কারণের পিছনের কারণ কী তা খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছেন। কারণের পিছনের কারণ খোঁজার ক্ষেত্রে অবশ্য এনিমেটর প্রশ্ন উত্থাপন করে সহযোগিতা করেছেন। কারণের পিছনের কারণ খুঁজতে যেয়ে গবেষকদের মধ্যে বেশ বিতর্ক হয়েছে। কোন কোন বিষয়ে ১/২ দিনেও বিতর্ক মেটেনি। সে বিতর্ক গবেষণার সভার পর বাড়ীতে যেয়েও চলেছে। যেমনঃ মঙ্গা হওয়ার বড় কারণ হিসাবে কাজ না থাকা ও সে কারণে অর্থের অভাবকে প্রথমে সবাই চিহ্নিত করেন। তখন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় অর্থের অভাব হয় কেন? উত্তর এসেছে কাজ নেই সে জন্য। কাজ নেই কেন? উত্তর- এলাকায় কাজ নেই, কাজের তুলনায় লোক বেশি তাই কাজ পাওয়া যায় না। প্রশ্ন কাজ না থাকা অবস্থায়ও কেউ কেউ কাজ পায় কেমন করে? কেউ কেউ ভাল থাকে কেমন করে? এসব প্রশ্নের বিভিন্ন ধরনের উত্তরের মধ্য দিয়ে গবেষকরা নিজেরাই অনেক নতুন বিষয় খুঁজে বের করেছেন যা আগে কখনও তারা ভাবেননি। যারা কাজে বেশি দক্ষ তাদের কাজ সব সময় থাকে। যারা শুধু কৃষি নয় বিভিন্ন ধরনের কাজ জানেন তাদের কখনও কাজের অভাব হয় না। এরকম উত্তর বিভিন্ন গবেষক খুঁজে বের করেন। এর পর প্রশ্ন ওঠে যে একাধিক কাজ জানেন তারা এবং যারা জানেন না তাদের মধ্যে কীসের পার্থক্য, কোথায় পার্থক্য ? এর উত্তর খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ড় পৌঁছায় পার্থক্য জ্ঞান, বুদ্ধিতে। আর জ্ঞান বুদ্ধি থাকে মাথায়। মাথা খাটিয়ে একজন আর একজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা পার্থক্য হয়েছে। এখানেই থামেনি আলোচনা। জ্ঞান বুদ্ধি বাড়ে কীভাবে এরকম প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে দেখা যাচ্ছে সবাই মাথা খাটিয়ে দেখছেন ও উত্তর দিচ্ছেন। এর মধ্যে কোন উত্তর হয়তো তেমন যুক্তিসঙ্গত হচ্ছে না, তাতেও সমস্যা নেই। যার উত্তর যুক্তিসঙ্গত সবাই সেটা মানছেন। জ্ঞান কীভাবে হয় তার উত্তরে বিভিন্ন দল বলেছে, দেখে শুনে, বুঝে, ঠেকে, পাঁচ জনে কথা বলে, চিন্ড়া করে, কাজ করে জ্ঞান-বুদ্ধি সৃষ্টি হয়। এভাবেই তারা একটি প্রশ্নকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে আলোচনার গভীরে প্রবেশ করেছেন।

একটি বিতর্ক গবেষকদের সব দলেই হয়েছে। তা হলো টাকার জোর বেশি না জ্ঞানের জোর বেশি। প্রাথমিক পর্যায়ে সবাই টাকার পক্ষেই থেকেছেন। কিন্তু বিশে- ষণ ও বিতর্ক যত গভীর হয় ততই জ্ঞানের পক্ষের যুক্তি বাড়তে থাকে। কয়েকদিনের বিতর্কে শেষ পর্যন্ড় সবাই জ্ঞানই আসল শক্তি এমন যুক্তিতে আসেন। টাকা নয় জ্ঞানই মানুষষকে চালিত করে, টাকা অর্জন ও ব্যবহারের জন্য জ্ঞান দরকার এরকম

সিদ্ধান্তে তারা উপনীত হন। এই বিষয়টি আলোচনার পরই গবেষকদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং গবেষণার প্রতি বেশি আগ্রহী হয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়। তাদের নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধিকে খাটানোর বিষয়ে ভাবতে থাকেন। গবেষকদের বিশে- ষণ থেকে মঙ্গার মূল কারণ হিসাবে **নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধির চর্চার অভাবকে** একটা বড় কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন।

স্বামী-স্ত্রী, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ও পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে হওয়া ঝগড়াকে মঙ্গার একটি অন্যতম কারণ হিসাবে গবেষকরা চিহ্নিত করেছেন। ঝগড়া সাধরনত হয় কেন তা খোঁজার চেষ্টা করেছেন। ঝগড়ার কারণ হিসাবে যে সকল বিষয়কে তারা চিহ্নিত করেছেন তা হলো, ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যেকার মারামারি, হাঁস, মুরগী, গর, ছাগলে ক্ষেত খাওয়া, যৌতুকের টাকা দিতে না পারা, একে অপরের নামে গিবত করা, ছোট-খাট চুরি করা, টাকা বা কোন কিছু ধার করে পরিশোধ না করা বা পরিশোধে বিলম্ব করা, জুয়া খেলা, জেদ করা, কেউ কাউকে মিথ্যা কথা বলে লাগিয়ে দিলে, হিংসা করা, সন্দেহ করা ইত্যাদি। ঝগড়ার কারণ বিশে- ষণ করতে যেয়ে দেখা যায় খুব ছোট বা নগন্য কারণেই বেশিরভাগ ঝগড়া হয়ে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সাধারণত স্বামীর জুয়া খেলা, যৌতুকের টাকা দিতে না পারা ও এক অপরের প্রতি চারিত্রিক সন্দেহ থেকে বেশিরভাগ ঝগড়া হয়ে থাকে। ছোট ছেলে-মেয়েদের মারামারি করার মত তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেখা গেছে এক পরিবারের সাথে অন্য পরিবার দিনের পর দিন ঝগড়া করেছেন। আর এ ঝগড়ার ফলে হিংসা-প্রতিহিংসা বেড়ে গেছে, সৃষ্টি হয়েছে মানসিক অশান্তি, সংসারে অশান্তি। হিংসার জন্য একে অপরের ক্ষেত ও পশু-পাখির ক্ষতিও করে থাকেন কেউ কেউ।

ঝগড়ার ফলে কী ঘটে এরকম আলোচনায় তারা বলেছেন, ঝগড়ার ফলে মন, শরীর দুই খারাপ হয়। সংসারের কাজ-কাম হয় না, ছেলে-মেয়েদের প্রতি যত্ন নেওয়া হয় না। এজন্য সংসারে অনেক আর্থিক ক্ষতি নেমে আসে। একজন নারী গবেষক বললেন, একবার স্বামীর সাথে রাগারাগি করে সারাদিন ঘরে শুয়েছিলাম। স্বামীও সারাদিন বাড়ী আসেনি। সেদিন অনেকগুলো মুরগী মারা গিয়েছিল। অনেক পুর ষ বাড়ীতে ঝগড়া করে বাইরে যেয়ে পকেটে যে কয় টাকা থাকে তা হোটেলে খেয়ে শেষ করে দেন। ঝগড়া বিষয়ে মতামতে গবেষকরা আরও বলছেন, যে সকল পরিবারে ঝগড়া-বিবাদ হয় প্রায়ই সমাজে তাদের মান-মর্যাদাও কমে যায়। দেখা যাচ্ছে, পরোক্ষভাবে ঝগড়া বিবাদও মঙ্গার একটা অন্যতম কারণ।

ঝগড়া-বিবাদের কারণ ও কারণের পিছনে কারণ কী তা খুঁজতে যেয়ে গবেষকরা শেষ পর্যন্ত এ ক্ষেত্রেও মূল কারণ হিসাবে নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি চর্চার অভাবকেই দায়ী করেছেন।

যৌতুক দেওয়াকে মঙ্গার কারণ হিসাবে কেন ভাবছেন এ প্রশ্ন উত্থাপিত হলে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে কোন কোন পরিবার একাধিক মেয়েকে যৌতুক দিতে যেয়ে বাড়ীর ভিটের জমিটুকু পর্যন্ত বিক্রয় করে ফেলেছেন। এরকম পরিবার প্রতি বছর মঙ্গায় পড়ছেন। তাছাড়া যৌতুক দিতে যেয়ে আর্থিকভাবে যে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন তাতে মঙ্গায় পড়ার মত পরিস্থিতে থাকছেন। সেদিক থেকে বলা যায় সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে যৌতুক দেওয়া মঙ্গার কারণ।

হরতাল মঙ্গার কারণ কেন এ প্রশ্নে গবেষণা বেশি দূর এগোয়নি। সকলেই বলছেন তারা শুনেছেন হরতাল হলে জিনিস পত্রের দাম বাড়ে। সে জন্য তারা হরতালকে মঙ্গার একটি কারণ বলছেন। একইভাবে সরকারের দোষের বিষয়টিতে তেমন বেশি আলোচনা ছাড়াই সকলে বলছেন, সরকারের দোষেই তো মঙ্গা হচ্ছে, কারণ সরকার ঠেকানোর ব্যবস্থা নিতে পারলে তো মঙ্গা হতো না।

গবেষকরা মঙ্গার কারণ হিসাবে যেসকল বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন তার মধ্যে কিছু আছে সরাসরি কারণ আর অন্যান্য সকল কারণই পরোক্ষভাবে মঙ্গার কারণ। পরোক্ষ হলেও মঙ্গা সৃষ্টি হওয়ার জন্য সে সকল কারণ অত্যন্ত গুর ত্বপূর্ণ।

গবেষকরা বলছেন মঙ্গা কমবেশি প্রতি বছরই হয়। মঙ্গার ফলে সবাই সমান কষ্ট পান ব্যাপারটি তেমন নয়। বুদ্ধি বিবেচনা করে না চলার জন্য সংসারে অনেকেই নিঃস্ব হয়েছেন আর তারাই বেশি বেশি মঙ্গার কবলে পড়েন। কেস স্টাডিতে সেরকম একটি ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, মামলায় পড়ে ভাই-বোন কীভাবে নিঃস্ব হয়ে মঙ্গায় পড়েছেন।

(দেখুন সংযোজনী-১)

মঙ্গার কারণ বিশে- ষণ করতে যেয়ে গণগবেষকরা প্রথমে যে ৪০ প্রকার কারণ বের করেছেন সে সকল কারণের পিছনের কারণ খুঁজতে যেয়ে যে কারণটিকে মূল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন তা হলো- নিজেদের সৃজনশীলতা বা জ্ঞান বিকাশের চর্চার অভাব। সাথে সাথে এটাও চিহ্নিত করছেন যে শুধু আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকলে জ্ঞানের বিকাশ ঘটবে না। সে জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যখন যেখানে সম্ভব সামর্থ্য অনুযায়ী উদ্যোগ নিলেই জ্ঞান-দক্ষতার বিকাশ ঘটবে একসাথে। গবেষণা করে নিজেদের উপলব্ধি থেকেই তারা তাদের সামর্থ্যের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করছেন।

৪টি দলে যে সকল উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে তার ধরণ ও সংখ্যা নীচের টেবিলে দেখানো হলো

ক্রমিক নং	উদ্যোগের নাম	সংখ্যা
০১	শাক সবজি চাষ	২৫ জন
০২	গাছ লাগানো	১০ ”
০৩	ক্ষুদ্র ব্যবসা	৪ ”
০৪	জমি বর্গা নিয়ে আবাদ	৫ ”
০৫	জমি কন্ট্রাক নিয়ে আবাদ	১ ”
০৬	ভি জি ডি কার্ড নিতে ঘুষ দিবে না	২ ”
০৭	মজুরী হিসাবে ক্যাথা সেলাই	২০”
০৮	মরিচ গাছ লাগানোবাড়ীতে	১০ ”
০৯	জুয়া খেলা বন্ধ	৫ ”
১০	ব্যক্তিগত সঞ্চয় শুর“	২০ ”
১১	হাঁস মুরগী পালন	২০ ”
১২	বাঁশের ধারা গাথা	৫”
	মোট	১২২ জন

যে সকল উদ্যোগ গবেষকরা গ্রহণ করেছেন এগুলো কম বেশি আগে থেকেই তাদের জানা ছিল। কিন্তু এসব কাজকে তেমন গুর“ত্ব দেননি আগে। তাই ভালভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। আগে যা করা হয়েছে সেখানে তেমন পরিকল্পনা ছিল না। এখন গুর“ত্বের সাথে চিন্ড্র-ভাবনা করে কাজটি করছেন। ফলে একই সাথে বহুমুখী কাজের পথ ভাবছেন। সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি তা হচ্ছে এখন তারা উপলব্ধি করছেন, তাদের উন্নতির জন্য তাদের নিজেদেরকে ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। কপালে যা আছে তাই হবে এভাবে ভেবে চললে কোন উন্নতি হবে না। এই উপলব্ধিই তাদের সক্রিয় করেছে। আসলে গবেষকরা চিন্ড্র জগতে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। তাই তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজে হাত দিয়েছেন। দলের সবাই যে ভালভাবে ভাবছেন তা নয়। আগের যে সকল ভ্রান্ড়, চিন্ড্র দীর্ঘদিন ধরে তাদের মধ্য সক্রিয় ছিল সেখান থেকে সহজে বের হতে পারছেন না। দেখা যাচ্ছে একজন গবেষক প্রশ্ন তুলেছেন যে, ‘‘টাকা ছাড়া কোন কিছু করা সম্ভব না। আমি অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে ঠিক করলাম ৫০০ টাকা হলে একটা ছোট ব্যবসা শুর“ করবো। দুদিন ধরে চেষ্টা করছি কাহই টাকা দিচ্ছে না। সুধের উপর টাকা নিতে গেলাম তাও পেলাম না। এখানে বুদ্ধি খাটিয়ে কোন লাভই হচ্ছে না।’’ এ প্রশ্নটি গবেষণা বৈঠকে উঠলে বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন মতামত দিতে থাকলেন। মতামতগুলো ছিল এরকম-

* যেখানে যেয়ে টাকা পাওয়া যাচ্ছে না সেখানে বাদ দিয়ে নতুন জায়গা খুঁজে দেখতে হবে টাকা পাওয়া যায় কী না।
* ৫০০ টাকা না পওয়া গেলে কিছু কম করে খুঁজতে হবে।
* যে ব্যবসার বুদ্ধিটা করা হয়েছে যদি ওইটা না পারা যায় অন্য কোন ব্যবসার বুদ্ধি করতে হবে।

* ব্যবসা করার বুদ্ধিতে যদি কাজ না হয় অন্য কোন বুদ্ধি করতে হবে।

এরকম বহু ধরনের সমাধানের বক্তব্য আসার পর প্রশ্ন উত্থাপনকারী গবেষক তাদের সাথে একমত হলেন যে, মাথা খাটিয়ে কিছু একটা করতে হবে। টাকা নেই বলে বসে থেকে কিছু হবে না। আলোচনায় সবাই একমত হলেও ঘুরে ফিরে টাকার প্রশ্নটি আবার ফিরে আসে মাঝে মাঝেই। তারপরও লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাদের সবার মধ্যে বেশকিছু পরিবর্তন দ্রুত ঘটছে। গবেষণা করার পর পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ কমেছে ব্যপকভাবে। পাড়া-পড়শীদের মধ্যে প্রতিদিনই যেখানে ঝগড়া হতো এখন সেখানে ঝগড়া হচ্ছে না বললেই চলে। পাড়ার লোকজন বলাবলি করছে ৩ ভাগের ২ ভাগ ঝগড়া কমে গেছে গবেষণা করার পর।

গাছ লাগানো ও শিশুদের নিয়ে শিশু গবেষণা কেন্দ্র খোলা এই দুটি কাজকে তারা পরবর্তীতে ফলাফল পাওয়া যাবে সেরকম কাজ হিসাবে বলছেন। তারা বলছেন এ দুটি কাজ ভালভাবে করতে পারলে ভবিষ্যতে মঙ্গা হতে রেহাই পাওয়া যাবে।

মঙ্গা দূর করার ক্ষেত্রে নিজেদের নেওয়া উদ্যোগের পাশাপাশি অন্যদের সহযোগিতার কথাও তারা বলছেন। যেমন মুরগী পালন করতে যেয়ে হঠাৎ করে রোগে সব মুরগী মারা যায়। অনেক সময় পাড়া ধরে মুরগী মরে যায়। ছাগলও কোন কোন সময় রোগে মারা যায়। এসব রোগ প্রতিরোধের জন্য তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে আগ্রহী। তারা উন্নত সেলাই প্রশিক্ষণ করতে আগ্রহী কিন্তু তেমন উদ্যোগী প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাচ্ছেন না।

গবেষকরা একতা গড়ার উপর জোর দিয়েছেন। ভিজিডির কার্ডে দুর্নীতি ঠেকাতে, যৌতুক ছাড়া বিয়ে দিতে, সালিশ বিচারে অংশ গ্রহণ করতে ও অন্যান্য যেকোন বড় কাজ করতে একতার দরকার খুবই। সেজন্য অন্য গ্রামে গবেষণা হলে একতা হতো। একাজে তারা এনিমেটরের সহযোগিতা চেয়েছেন। তবে নিজেরাও অন্য পাড়া বা গ্রামে গবেষণার বিষয়টি সবাইকে বলবেন। কিন্তু তাতে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে। সে জন্য তাড়াতাড়ি করতে এনিমেটরদের সহযোগিতা এখন বেশি দরকার বলে তারা মনে করেন।

শিশু গবেষণা কেন্দ্র

গণগবেষক ও স্থানীয় সেচ্ছাসেবী এনিমেটরদের উদ্যোগে ডাঙ্গাপাড়া ও করলাবেচাটারীতে ২টি শিশু গবেষণা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। গবেষকদের দেওয়া ঘরে (৭ হাত ×১২হাত) ৫ বছরের নীচে বয়স এরকম ৩০ জন শিশু সপ্তাহে ৬ দিন (শুক্রবার বাদে) সকল ৮টা হতে সাড়ে ১০টা এই আড়াই ঘন্টা একজন সেচ্ছাসেবী এনিমেটরের সহযোগিতায় গবেষণা করে। শিশুদের বিভিন্ন পারদর্শীতায় এনিমেটর মূলতঃ সহায়কের ভূমিকা পালন করেন। কবিতা, ছড়া, গান, নাচ,গল্প, কিচ্ছা বলা, বর্ননা বলা, মাটিও স্থানীয় উপকরণে বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরী করা এ সবই চলে শিশু গবেষণা কেন্দ্রে। বিষয় নির্ধারণ, কে কখন বলবে, ঝগড়া বিবাদ মিটানোসহ সব বিষয়েই এনিমেটর শিশুদের সহযোগিতায় করে থাকেন। এনিমেটর কোন কিছু চাপিয়ে দেন না। এ পদ্ধতিতে শিশুরা দেখা, শোনা, বলা, শারীরিক দক্ষতাসহ নানা বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠছে। পাল্টে যাচ্ছে শিশুদের আচার-ব্যবহারও। শিশুদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ কমে যাচ্ছে। পরিবর্তন হচ্ছে গালাগালি করার মত বদ অভ্যাস। আগামী কালের ক্লাসে নতুন কী উপস্থাপন করা হবে তা নিয়ে বেড়েছে শিশুদের ব্যস্ড়তা। নতুন ছড়া, গল্প শেখানোর জন্য শিশুরা মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্যদের বেশ জ্বালাতন করছে। এতে অভিভাবকরা খুশীই হচ্ছেন। শিশুদের এই পরিবর্তনে অভিভাবকরা খুবই আগ্রহী হয়ে উঠছে শিশু গবেষণার কেন্দ্রের প্রতি।

স্বেচ্ছাসেবী এনিমেটর দল

গণগবেষণার কাজ দেখে স্থানীয় কিছু যুবক যুবতী কাজটির ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠলে তাদের নিয়ে সেচ্ছাসেবী এনিমেটর দল গঠন করা হয়েছে। তারা প্রতিদিন নিজেদের মধ্যে ২ ঘন্টা কর্মশালা করছেন এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য গণগবেষণার দলে বসছেন। তাদেরই মধ্য হতে ৩ জন নারী আগ্রহী হয়ে ২ টি শিশু গবেষণা কেন্দ্র করেছেন। মঙ্গা বিষয়ক গবেষণা শেষ হলে বাইরের এনিমেটররা চলে যাবেন, তাই গণগবেষণা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সেচ্ছাসেবী এনিমেটররা দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছেন দলভিত্তিক।

সেচ্ছাসেবী এনিমেটর দলে আছেন- ১। শিউলী বেগম (২৬) ২। তহুরা আক্তার (১৫) ৩। ময়না আক্তার (১৪) ৪। আরজিনা বেগম (২২) ও ৫। নার্গিস (২০)।
শিউলী বেগম ও ময়না আক্তার ১টি এবং তাহুরা আক্তার ১টি শিশু গবেষণা কেন্দ্র পরিচালনা করেন।

গবেষণার ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠান

২৭ মার্চ, ২০০৫ সকাল ১১ টায় খুটামারা ইউনিয়নের করলাবেচাটারীর শিউলী বেগমের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হলো গণগবেষণার ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠান। গবেষকরা দলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ড় নিয়েছিলেন প্রতিটা দল হতে ১০ জন করে গবেষক এ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। সেই সাথে পুর"ষদের মধ্য হতে থাকবেন ১০ এবং শিশুদের মধ্য হতে ১০ জন। আর আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে থাকবেন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, দুই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, গবেষণায় সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব), ঢাকা ও ইউএসএস, নীলফামারীর প্রতিনিধি। অনুষ্ঠানের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা স্বেচ্ছাসেবী এনিমেটর ও কিছু গণগবেষক।
বাস্ড়বে অনুষ্ঠানে সকল পক্ষ উপস্থিত থাকলেও পুর"ষ গবেষকদের মধ্য হতে উপস্থিত ছিলেন মাত্র কয়েকজন। আর চেয়ার ম্যান মেম্বারদের পক্ষ হতে মোটেই কেউ উপস্থিত হননি। অত্যান্ড় উৎসাহ নিয়ে নারী গবেষকরা নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে কিছু বেশিই উপস্থিত হয়েছেন। পুর"ষ গবেষকদের অনুপস্থিতির কারণ সম্পর্কে জানা যায় এ সময় মাঠে তামাকের ক্ষেতে জর"রী কাজ চলছে তাই তারা অংশ নিতে পারেননি। এ বিষয়ে একজন নারী গবেষক মন্ড়ব্য করেন, পুর"ষরা তো ভালভাবে গবেষণা করেনি তাই অনুষ্ঠানে কী বলতে কী বলে ফেলবে সেই ভয়েই আসেনি। তাছাড়া পর"ষ এনিমেটর যথেষ্ট সময় দিয়ে কাজটিতে তার দক্ষতার রাখতে পারেননি। আর চেয়ারম্যান মেম্বারদের উপস্থিত না হওয়ার বিষয়ে অনষ্ঠানে বেশ উচ্চ স্বরেই আলোচনা হয়েছে যে, এরকম অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান মেম্বাররা আসবেন না। কারণ এখানে ভিজিডি কার্ড, বিধবা ও বয়স্ক ভাতার কার্ডে যে ঘুষ নেওয়া হয় সে বিষয়ে আলোচনা উঠবে এটা তারা জানেন। এসব বিষয়ে জবাব দেওয়ার ভয়েই কথা দিয়েওে তারা শেষ পর্যন্ড় উপস্থিত হননি। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে রিইব এর প্রোগ্রাম অফিসার রানা সুলতানা, জনকণ্ঠ, প্রথম আলো, আমার দেশ এর নীলফামারী জেলা প্রতিনিধি ও ইউএসএস, নীলফামারীর ৪ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে মূলত: তিনটি বিষয় ছিল- (১) ৪ মাসের গণগবেষণা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরী করা প্রতিবেদন পাঠ ও মতামত গ্রহণ (২) মুক্ত আলোচনা (৩) শিশু গবেষকদের ছড়া, গান, গল্প উপস্থাপন।
মুক্ত আলোচনায় যৌতুক এর ক্ষতিকারক দিক ও ঠেকানোর উপায় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। মতামতে তারা বলেন যৌতুক নিয়ে কোন লাভ হয় না। যৌতুকের টাকা মাইক্রো ভাড়া, খাওয়া- দাওয়া, নানা ধরনের জিনিপত্র কেনার মধ্য দিয়ে বড়লোকদের হাতেই চলে যায় মধ্য থেকে বর কনে উভয় পরিবারই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ঠেকানোর ব্যাপারে তারা কোন পথ পাচ্ছেন না। প্রশ্ন ওঠে আপনারা যৌতুক নেওয়া দেওয়া করবেন কীনা? এ প্রশ্নের উত্তরে গবেষকরা বলেন, আমরা বুঝেছি যৌতুক লেন-দেন খারাপ, বিয়ে তো আমাদের পাড়ার মধ্যে হবে না। অন্য গ্রামের লোকেরা তো বুঝছে না, তারা বুঝলে এটা বন্ধ করা সম্ভব হতো। অন্য গ্রামের লোকদের কীভাবে বোঝানো যায় এ প্রশ্নে তারা বলেন, আমরা চেষ্টা করবো অন্য গ্রামের লোকদের গবেষণা করে বোঝানোর জন্য। কেউ কেউ বলেন, এনিমেটররা সহযোগিতা করলে তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে।
আলোচনায় পশু চিকিৎসার বিষয়টি আসে। অনেক গবেষক বলেন, আমরা বেশি বেশি করে মুরগী, ছাগল পালনের উদ্যোগ নিয়েছি। কিন্তু হঠাৎ করে অল্প সময়ে প্রায় সব মুরগী মরে গেছে। মুরগী চিকিৎসার প্রশিক্ষণ থাকলে এরকম হতো না। কীভাবে প্রশিক্ষণ করা যাবে তেমন কোন সমাধান আলোচনায় হয়নি।

উপসংহার

স্বল্প সময়ের এ গবেষণায় এটাই দৃশ্যমান হয়ে উঠছে যে, মঙ্গা কবলিত মানুষেরাই মঙ্গা প্রতিরোধে প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারেন। গবেষণার মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের নতুন করে খুঁজে পেয়েছেন। তারা এখন ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারছেন অন্যের সাহায্যের আশায় অপেক্ষা করলে নিজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। নিজের সামর্থ্যের মধ্যে যা কিছু করা সম্ভব তাই করতে হবে। তাইতো অলসতা ঝেড়ে গ্রহণ করেছেন নানা ধরনের উদ্যোগ। তাদের গ্রহণ করা ছোট ছোট উদ্যোগ বয়ে আনবে তাদের আর্থিক ও সামাজিক সাফল্য। এক্ষেত্রে বাধা আছে অনেক। প্রথম বাধা নিজের চিন্ড়া জগতে। দীর্ঘদিন ধরে যেভাবে তারা ভাবতে অভ্যস্ড় হয়ে পড়েছে সেই চিন্ড়া-ভাবনা দলগতভাবে বসে যেভাবে বিদায় দিচ্ছেন সেটা বারে বারে ঘুরে আসছে। তখনই তার কাছে জ্ঞানের চেয়ে অর্থ বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। অন্যদের সাথে মতবিনিময় হলে দেখা যাচ্ছে আবার তারা বাস্ড়বমুখী চিন্ড়ায় ফিরে যাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে উজ্জীবকের ভূমিকা একটা গুর"ত্বপূর্ণ অবস্থানে আছে বলে মনে হয়। স্বল্প পরিসরের এ মানুষগুলির চিন্ড়ার জগতে যে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে তা সমাজের প্রচলিত চিন্ড়ার সাথে সংঘাত হচ্ছে সব সময়। চারিদিকের প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করে তাকে অগ্রসর হতে হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে এই প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করে কতটা প্রসার হবে বা টিকে থাকবে। এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় একবার যাদের চিন্ড়ায় পরিবর্তন ঘটেছে তারা নিশ্চয় টিকে থাকবেন। কিন্তু ভালভাবে টিকতে হলে অবশ্যই সে চিন্ড়ার প্রসার হওয়া দরকার। আর দ্র"ত প্রসার ঘটাতে হলে যারা সত্যিকার অর্থেই দারিদ্র মঙ্গা প্রতিরোধ বা দারিদ্র বিমোচন করতে চান সেই সকল সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সিভিল সোসাইটি ও ব্যক্তিকে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। গণগবেষণার এ পদ্ধতি ছড়িয়ে দিতে পারলে সত্যিকার অর্থেই সমগ্র উত্তর বঙ্গ হতে মঙ্গা বিদায় করা সম্ভব। মঙ্গা বিদায়ে প্রধান ভূমিকা ভূক্তভোগীরা পালন করলেও অন্যান্য সংশি- ষ্ট সকল পক্ষের সহায়তার ভূমিকাও অত্যান্ড় গুর"ত্বপূর্ণ। সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সেবা নিয়ম অনুযায়ী প্রাপ্তির বিষয় নিশ্চিত করা গেলে মঙ্গা হ্রাস করা সম্ভব। এ অঞ্চলে বাস করা সরল, সোজা নিরীহ প্রকৃতির মানুষগুলো নানা ধরনের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকলেও যে কোন উদ্যোগে তারা ইতিবাচক। কৃষিভিত্তিক সব ধরনের উৎপাদনের জন্য আছে অনুকুল পরিবেশ। এজন্য প্রয়োজন সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা। তা সম্ভব হলে নিশ্চয় মঙ্গা বিদায় নেবে। গড়ে উঠবে আলোকিত উত্তরাঞ্চল।

ধন্যবাদসহ-
আলাউদ্দিন আলী, গবেষণা সমন্বয়কারী।
৩১ মার্চ, ২০০৫

(সংযোজনী-১)

মামলায় পড়ে নিঃস্ব হয়েছেন ভাইবোন

মঙ্গার সময় প্রচন্ড কষ্ট পেয়েছেন গবেষক মোতাহারা বেগম (৩৫) স্বামী আব্বাছ আলী (৪৫) গ্রাম ডাঙ্গাপাড়া, দক্ষিণ দেশীবাই। একটি মাত্র ঘর তার, তাতে নেই বেড়া ও দরজা। গবেষণায় বসে মোতাহারা বেগম নতুন করে অনেক কিছু ভাবছেন ঘটে যাওয়া অতীতের ঘটনা নিয়ে। সবকিছু তার চোখের সামনে ভেসে ওঠছে। কেমন করে ঝগড়া বিবাদ ও মামলায় পড়ে কীভাবে নিঃস্ব হয়েছেন। তা মোতাহারা বেগমের মুখেই শোনা যাক।

"আমরা চার ভাই বোন। আমি স্বামীকে নিয়ে বাবার বাড়ীর কাছেই থাকি। আগে আমার স্বামী ধানের ব্যবসা করত তার সাথে আমাদের তামাক ও মুড়ির ব্যবসা ছিল। আমাদের সংসার ভালই চলছিল। কিছু উন্নতি হচ্ছিল। বছর দুই আগে আমার বড় ভাই গুলজার বাড়ীর কাছেরই একটি জমিতে কিছু নিমের চারা লাগিয়েছিল। চারা একটু বড় হতেই চারাগুলি বাঁশের ঝিক পুতে পলিথিন দিয়ে বেধে দিয়েছিল। গত বছর ফাল্গুণ মাসের কথা। সেদিন আমি বাড়ী ছিলাম না। আমি আর আমার স্বামী রাজার হাটের কাছে পাকা রাস্ড়ায় ধান শুকাতে গিয়েছিলাম। বাড়ী আসার পথেই চিল-াচিলি- শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটলাম। তখন ঝগড়া অনেকটা কমেছে। এসে শুনলাম তেমন কিছু না। ছোট ছাওয়া নিয়ে ঝগড়া। ঘটনা হলো আমার ভাইয়ের নিম গাছের ঝিকের বাধন খুলে দিয়েছে আমার আর একভাই মন্ড়জের ছেলে আর আমার এক ছেলে। এইটা দেখে বড় ভায়ের বউ শরীফা যাচ্ছেতাই খারাপ ভাষায় গালাগালি করছে। শরীফা একটু চিন্ড্র করল না যে ছাওয়াগুলো আমাদের শরীকদের। মন্ড়জের বউ এত গালাগালি সহ্য করতে না পেরে উত্তর দিয়েছে। তখন ঝগড়া কিছুক্ষণ হওয়ার পর আমি যাই। সে সময় ঝগড়া মিটে যাই। আমার ভাইয়ের বাড়ীর কাছেই একজন দেওয়ানী মাতব্বর আছে তার নাম কাবিলউদ্দিন। ঝগড়ার দিন রাতে দেওয়ানীর সাথে আমার ভাইয়ের গল্প করতে দেখেই আমার মনে সন্দেহ হয়। তখনই আমার মনে হয় দুজনে কোন কুবুদ্ধি করছে। রাত পোহানোর পরই দেখি শরীফা আবার গাল দেওয়া শুর" করেছে। আমার স্বামী থামানোর চেষ্টা করে। বলে কেন গালাগালি করছ, যা হবার হয়েছে এখন চুপ কর। শরীফা তখন বলছে মোর স্বামী আর মোকে (আমাকে) তুই চুপ করতে বলছিস। তোর এত সাহস নাউয়া, গোলামের বেটা তুই মোর বাল কামাতে আসছিস। এই কথা বলে কাপড় উচু করছে। এটা দেখে পুর"ষ মানুষ তার ধৈর্য্য কি থাকে। তাও আমার স্বামী মাথা নিচু করে চলে আসে ঘরে। তখন শরীফার স্বামী বাড়ি হতে বের হয়ে এসে আমাদের মার শুর" করছে। কিছুক্ষণ পর দেওয়ানী কাবিলউদ্দিন পকেট থেকে গ্যাস লাইট বের করে আমার ভাই গুলজারের হাতে দিল আর বললো নিজের ঘরে আগুন ধরাইয়া দে। সে সময় আমার ভাবী ভাইয়ের পা চেপে ধরে বলছে নিজের ঘরে নিজে আগুন ধরিয়ে দিস না। আমার সংসার সব পুরে যাবে। তখন কাবিলউদ্দিন দেওয়ানী শরীফাকে টেনে নিয়ে গেল দূরে। গুলজার ঘরে আগুন ধরিয়ে দিল। সব দূঃখ মনে রেখে আমরা ঘরের আগুন নিভিয়ে দিলাম। দেওয়ানী গুলজারকে বললো থানায় যেয়ে কেস করে দে। গুলজার শরীফাকে হাসপাতালে রেখে এলো। আমরা দূশ্চিন্ড়য় পড়ে গেলাম। প্রথমে শুনলাম হাসপাতাল হতে সার্টিফিকেট নিয়ে নারী নির্যাতন মামলা করবে। কিন্তু পরে দেখলাম বাড়ী পোড়া কেস করে দিয়েছে আমাদের নামে। আমি ভাইকে বললাম আমাদের ভাই বোনের ক্ষতি হবে পর মানুষে টাকা খাবে। আমরা মীমাংসা করে ফেলি। আমরা শাহীন চেয়ারম্যানকে ডেকে এনে বললাম গুলজারের বাড়ী পুড়ে যা ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতি পূরণ করব আর মামলা করতে যে খরচ হয়েছে সে টাকাও দেব। কিন্তু গুলজার তা মানে নি। সে খরচ বাদে আরও ১০ হাজার টাকা বেশি চায়। তখন শাহীন চেয়ারম্যান বলেছিল, তোকে অতগুলো টাকা না দিয়ে থানায় গেলে আপোষ করা যাবে। তখন থেকে আর কেস আপোষ হয়নি। সে কেস চলছে। কেসে পড়ে আমার সব গেছে। স্বামীর ধান ও মুড়ির ব্যবসা ধংস হয়েছে। বাড়ীর ভিটা জমি বিক্রি করছি। পরের জমিতে একটা চালা তুলে কোন রকমে ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকছি। ঘরের বেড়া নেই, কপাট নেই। ওদিকে ভাই গোলজারের সংসারও ভাল নেই। সে ৩টি গর" বেঁচে মেয়ে বিয়ের জন্য দশ হাজার টাকা গুছিয়েছিল। সে টাকা মামলায় শেষ হয়েছে। এখনও মেয়ের বিয়ে দিতে পারেনি। সবই আমাদের বুদ্ধির ভুল।

সংগ্রহে - শারমিন রীনা, এনিমেটর

মঙ্গায় মৃত্যু আসকার আলীর জীবনের কিছু কথা।

১৩ অক্টোবর'০৪ আসকার আলী (৪৫) ভিজিডি কার্ডের চাল তুলে বাড়ী ফেরার পথে মারা গেলে ১৫ অক্টোবর জনকণ্ঠ ও প্রথম আলোসহ বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় মঙ্গায় আসকার আলীর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর বের হলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় লোকজন ও তার পরিবার পরিজনদের নিকট থেকে শুনে আসকার আলীর জীবনের কিছু কথা তুলে ধরা হলো।

মৃত্যুকালে আসকার আলীর বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। ২ স্ত্রী ও ৪ ছেলে মেয়ে সন্তান রেখে যান। বড় স্ত্রী কমলা বেগমের ১ মেয়ে ও ছোট স্ত্রীর ৩ মেয়ে। তার মধ্যে বড় স্ত্রীর ১ মেয়ে ও ছোট স্ত্রীর ২ মেয়ে জেসমিন, আছমা ও আলিমার বিয়ে দিয়েছেন ছোট স্ত্রী ফিরোজা বেগম। তার মেয়ে ধোলি- ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখা-পড়া করেছে। ২ বছর গত হচ্ছে আর পড়শুনা করে না। আসকার আলীর বাবা আকবর আলীর ৪/৫ বিঘা জমি ছিল কিন্তু সে নিজে হাতেই সব বিক্রি করে শেষ করেছিল আসকার আলীর জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার আগেই। ছোট বেলা হতেই আসকার আলী সংসারের কোন কাজ কাম করেন নি। সুপারী চুরি আর সমবয়সীদের সাথে আড্ডা দিয়ে উচ্ছৃংখলভাবে চলাফেরা করেছেন। এলাকার খারাপ লোকদের সাথে ছিল তার চলাফেরা। ছোট বেলা হতে অন্য লোকের ছোট খাটো জিনিস চুরি করা ছিল তার অভ্যাস। মাঠের ধান চুরি করে কারো বাড়ীতে দিয়ে পিঠা খাওয়ার কথা সবাই জানে। ছোট-খাট চুরি বলে কেউ তাকে তেমন বলেওনি কিছু। যৌবনে পা দিয়ে আসকার আলী বিয়ে করে। তখনও সে সংসারের জন্য কোন কাজ করেনি। মানুষের ক্ষেতের ধান, পাট, গম, তামাক চুরি করে বিক্রি করে সংসার চালাতো। স্ত্রী কমলা বেগমকে বিয়ে করলেও স্ত্রী ও শ্বশুরের সাথে বনিবনা হয়নি প্রথম থেকেই। চুরি করা স্বভাবের কথা জেনে তিন বছরের মধ্যেই শ্বশুর তার মেয়েকে ছাড়িয়ে নিয়ে অন্যত্র বিয়ে দেয়। স্ত্রীকে ছেড়ে দেওয়ার সময় আসকার আলী তার মেয়ে সন্তানকে রেখে দেয় নিজের কাছে। কিছুদিনের মধ্যেই আসকার আলী ফেরজা বেগমকে বিয়ে করে। ফেরজা বেগমই তার প্রথম স্ত্রীর মেয়ে আসমাকে বড় করে। ফিরোজা বেগমের ৩টি মেয়ে হয়েছে। তারপরও আসকার আলী সংসারের কোন কাজ করেনি। অনেক কষ্ট করে ফিরোজা বেগম সতীনের ১ মেয়ে নিজের ২ মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। ৩ মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় আসকার আলী বসতবাড়ীর জমি বিক্রি করে যৌতুক পরিশোধ করে। পরবর্তীতে জামাইদের চাপে ঘর বিক্রি করে টাকা দেয়।

এর পর আসকার আলী রাস্তার সরকারী গাছের ডাল, গাছ, পাশের ইট ভাটার ইট চুরি করে বিক্রি করে সংসার চালাতো।

প্রতিবেশী লতিফ নামের একজন রাজশাহীতে রিকসা চালায়। সে তার স্ত্রীকে নিয়ে যায় রাজশাহীতে। তখন তার বাড়ী দেখা শুনার জন্য আসকার আলীকে দায়িত্ব দিয়ে যায়। তখন থেকে আসকার আলী এই বাড়ীতেই আছে।

অক্টোবর'০৪ মাসের ৮ তারিখে আসকার আলী তার মেয়ের বাড়ী বিন্নাকুড়ি যায়। সেখানে ৫দিন ছিল। এমন সময় ভি জি ডি কার্ডের চাউল দিবে বলে তার স্ত্রী ফিরোজা আসকার আলীকে খবর দেয়। ১৩/১০/০৪ সকালে আসকার আলী বাড়ী এসে ছোট মেয়ে ধৌলি-কে বলে কিছু খাবার থাকে তো দে মা। মেয়ে জানায় কোন খাবার নাই। তারপর আসকার আলী না খেয়েই ভিজিডির চাউল তোলার জন্য ইউনিয়ন পরিষদে যায়। চাউল নেওয়ার পর দুপুরের দিকে আসকার আলী ভ্যানে বাড়ী আসার পথে কাঠালী ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের মেম্বর আজিজার রহমানের বাড়ীর নিকট পৌছালে তার বুকে ব্যাথা ওঠে। তখন সে পানি খেতে চায়। ব্যাথায় ছটফট করছিল। পাশের বাড়ীর একজন মহিলা পানি এনে খাওয়ানোর পর ভ্যানের উপর আসকার আলীর মৃত্যু হয়।

এ ঘটনা খবরের কাগজে ছাপা হলে এলাকার কেউ কেউ বলে আমাদের বদনাম করে দিল। সাংবাদিকরা গেলে একজন মহিলা অন্য বাড়ী হতে ভাতের মাড় এনে তাদের দেখিয়ে বলেন- অভাবে আমরা মরে গেলাম। আমাদের খাবার কিছু নেই। আমাদের বাচাঁন। স্থানীয় বাসিন্দা আঃ মজিদসহ অনেকেই বলে ওটা কিছু না রিলিফ পাওয়ার জন্য ঐ সব কথা বলছে।

মৃত্যুর পর নীলফামারী ২ আসনের সাংসদ জনাব আসাদুজ্জামান নূর একটি টিনের ঘর দান করার কথা বলেছেন।

(সংগ্রহে আনারুল রিপন, এনিমেটর)

একটি ভিজিডি কার্ডের বয়ান

আছমা বেগম (৩৫) স্বামী মমতাজ আলী গ্রাম- করলাবেচাটারী, ইউনিয়ন খুটামারা। তার দুটি মেয়ে মনুফা ও মোমেনা। অভাবের সংসার আছমার। নাড়ুমুড়ির দোকান ব্যবসা করে কোনরকমে চলে তারা। আছমা বেগম ২০০৪ সালের জানুয়ারী হতে এক বছরের জন্য একটি ভিজিডি কার্ড পেয়েছিল। অনেক আশা ছিল ভিজিডি কার্ডের মাল তুলে সংসারটাক একটু সচল করবে সে কিন্তু তা হয়নি বরং ভিজিডি কার্ড তার সংসারে কিছু ক্ষতি বয়ে এনেছে। আর সেটাই যে নির্মম সত্য তা তার কথা থেকেই বোঝা যায়।

২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আছমা বেগম শুনেছিল ভিজিডি কার্ড দেওয়ার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ হতে তদন্ড় চলছে। এরই মধ্যে একদিন লুৎফর রহমান চৌকিদার আসলো তার বাড়ীতে কার্ড পাওয়ার যোগ্য কিনা তা দেখার জন্য। বাড়ীতে ২টি মুরগী দেখে চৌকিদার বললেন, "তোমার বাড়ীতে হাঁস মুরগী আছে তুমি কার্ড পাবে না। আর যদি কার্ড নিবার চান পাঁচ শত টাকা দিবার লাগবে। তা না হলে কার্ড দিয়া যাবে না।" আছমা বেগমের মনের মধ্যে তখন কার্ড পাওয়ার প্রবল বাসনা। যেভাবেই হোক টাকা যোগাড় করতে হবেই। পরের দিন মহাজনের নিকট হতে সুদের উপর পাঁচ শত টাকা নিয়ে চৌকিদারকে দিয়ে দিলেন। এর পর অপেক্ষার পালা। কবে কার্ডের মাল তুলবেন সেজন্য দিন গুনতে থাকেন আছমা বেগম। এদিকে কার্ডের মাল তুলতে বিলম্ব হলেও মহাজনকে ১০০ টাকায় মাসে ২০ টাকা হিসাবে মাসে মাসে সুদ দিতে হচ্ছে প্রতি মাসেই। এভাবে ৩ মাস চলার পর ২০০৪ সালের জানুয়ারী মাসে কার্ডের উপর প্রথম গম তোলেন আছমা বেগম। গম যা পেলেন তা বিক্রি করে প্রায় সব টাকা চলে গেল মহাজনের টাকা শোধ করতে। মহাজনের ঋণের আসল টাকা থেকেই যায়।

আছমা বেগম বললেন, একবার হামরা গম আনির গেছি, গাড়ীত করি একজন পুর"ষ ও একজন মহিলা বজ আসি হামাক সবাকে লাইন করি খাড়া করি জিজ্ঞাসা করছে, কার্ড দেওয়ার সময় আপনাদের কাছে কেউ টাকা নিয়েছে নাকি? তার আগেই মেম্বার হামাক ধমক দিয়া কইছে, তোমরা যদি টাকা দেওয়ার কথা কন সামনের মাস থাকি কার্ডের মাল দেওয়া বন্ধ করে দিব। তখন হামরা ভয়তে বলিনি যে হামরা টাকা দিছি। তারপর সেই বজ কইছে আমার সামনে গম মাপি দাও তো। তখন একটা ওয়ার্ডের মহিলাকে গম দিছে ছয় ধাড়া (৩০ কেজি)। আর যখন মানুষগুলা চলি গেছে তখন চার ধারা (২০ কেজি) করি গম দিছে। হামরাও চার ধাড়ি গম পাইছি। বাড়ী এসে মাপি দেখি ১৬ কেজি। তারপরের মাসে গম দেওয়ার সময় সেই লোকগুলা আবার আসি হামাক জিজ্ঞাসা করিছে তোমাকে কতগুলা গম দেয়। হামরা কইছি এইটে চার ধাড়ি মাপি দেয় কিন্তু বাড়ী যাইয়া মাপি দেখি ১৬ কেজি। এরপরের মাসে গম না দিয়ে আটার ব্যাগ দিছে। তখন চেয়ারম্যান, মেম্বার হামাক কী গাইল পাড়ছে। বলছে, অফিসার তোমার মায়ের ভাতার হয়, তোমরা কয়ে দিছেন হামাক ১৬ কেজি গম দেয়, এইবার থাকি আরও কার্ডের আশা করেন। আটার ব্যাগ ধরে দেওয়ায় চেয়ারম্যান মেম্বার যে খাইতে পারছে না সে জন্য হামাক গালাচ্ছে। সেই কার্ডের মাল মুই খাবার পাও নাই। ৫০০ টাকার সুদ হিসাবে একটা করে আটার বস্ড়া দিছি মহাজনকে। প্রতিমাসে সুদের টাকা বাড়ে। আটার বস্ড়ায় সুদের টাকা শোধ হলেও আসল ঋণ রয়েই যায়। পরে পুরা কার্ডটা দিয়া দিছি মহাজনকে ঋণ শোধের জন্য। কার্ডের মাল তো খাবার পাও নাই, আরও পকেট থাকি ৩০০ টাকা সুদ দিছি। এতে দেখছি কার্ডের মাল গরীবের জন্য নয়, ধনীর জন্য। যার টাকা আছে তাই কার্ড খাইবে।"

আছমা বেগম জানান, '১৮ মাসের মধ্যে ৪ মাস গম ও ৬ মাস আটা তুলেছি তারপর কার্ড মহাজনকে দিয়া দিছি।'

সংগ্রহে- শারমিন রিনা, এনিমেটর
১২/১২/২০০৪

মঙ্গা বিষয়ে গণগবেষকদের কিছু উক্তি

''মঙ্গার সময় কোন উপায় থাকে না, অভাব খিছি ধরে। তখন ঋণ ছাড়া কোন উপায় থাকে না। বাধ্য হয়ে ঋণ করি কোন রকম সংসার চালায়। তারপর স্বামী বিদেশ যায় (অন্য জেলায়) যেটুকু নিয়ে আসে তা ঋণ শোধ করি। '' - মঞ্জিলা বেগম, করলাবেচাটারী, খুটামারা।

''মঙ্গার সময় উপায় থাকে না কাহো জমি বেছাই, গর ছাগল, হাঁস মুরগী সব বেছাই।''

-শাহিদা, ডাঙ্গাপাড়, দক্ষিণ দেশিবাই।

''হামার এত্তি আকালের সময় কাউয়া, চিলায়ও ভাত না পায়, ফকিরও ভিক্ষা না পায়।''

- আনোয়ারা, করলাবেচাটারী, খুটামারা

''মঙ্গায় হামরা তো এলা ভালই থাকি, ছাওয়া ছোটগিলা নালা নুট (ছটফট) করে বেড়ায়।''

-আরজিনা, করলাবেচাটারী, খুটামারা।

''হামার মায়ের জাত। কখন কোন রকম শরীর থাকে বলা যায় না। যখন তখন মানুষের কলে পানি আনতে যাবার দেয় না।''

-বেগম, ডাঙ্গাপাড়া

''মঙ্গার সময় কোন উপায় না থাকিয়া আগাম মুজরীর টাকা নিয়া খাই। তাও ফির কম টাকা দেয়। না নিয়া কোন উপায় নাই। চলিবার তো লাগিবে। ''

-মেরিনা, সিট করলাবেচাটারী, খুটামারা।

''মঙ্গার সময় কোন উপায় না থাকিলে কী করিব। উপোষ আর কতদিন থাকা যায়। স্বামীরা ঢাকা যায় রিকসা চালায়, না হয় অন্য কোনঠে যায়। বগুড়া যায়, চিটাগাং যায় পেটের দায়ে কাম কাজ না করি তো কি করি।'' - শরীফা, করলাবেচাটারী, খুটামারা।

''মোর স্বামী বিদেশ যেয়ে ১ মাস কামাই করি খেলা খেলে ১৫ দিনের টাকা নিয়ে আইসে। বাড়ী আসি যতদিন টাকা ফুরাইবে না ততদিন জুয়া খেলাইতে থাকিবে।''

-মিসুয়ারা, করলাবেচাটারী, খুটামারা।

''হামরা তো আগোত এত খুটিনাটি চিন্ড়া কর নাই। লাভের আশাতেও টাকা ফেলে হামার লজ হয়েছে। এই রকম গবেষণা আরো আগোত আসিলে এতদিন উন্নতির ঘাট (পথ) করিনু হায়।''

-কহিনুর, করলাবেচাটারী, খুটামারা।

''মহিলাগুলার জন্য সংসার টিকে থাকে। আর পুর ষ মানুষ তো ব্যয় করার জম। একদিন কাম করে তো দুদিন নাই। জুয়া খেলায়, চা নাস্ড়া করে, মাগিবাজি করে এই ভাবে সংসার শেষ করে।''

-বেগম, ডাঙ্গাপাড়া, দক্ষিণ দেশিবাই।

''টাকা দিয়া সবকিছু হয় না। যদি হইল হায়, সনমান কিনলে হায়তো। মান সনমান কিনতে পাওয়া যায় নাকি।''

-নুর ন্নাহার, ডাঙ্গাপাড়া।

কেন্দ্রভিত্তিক গবেষকদের নাম ঠিকানা। স্থানঃ করলাবেচাটারী, খুটামারা ইউনিয়ন

ক্রমিক নং	গবেষকের নাম	বয়স	পেশা	স্বামীর নাম	গ্রাম
০১	মোছাঃ মঞ্জিলা বেগম	৪০	গৃহিনী	মোঃ আফতাব আলী	পশ্চিম খুটামার
০২	” হাসিনা বেগম	২৫	”	” মোকলেছার	”
০৩	” আফিজোন (১)	৫০	”	” দাউমামুদ	”
০৪	” মরিয়ম	৪০	”	” সাত্তার	”
০৫	” আফিজোন (২)	৪৫	”	” মনছের আলী	”
০৬	” ময়না বেগম	৩০	”	” আইনুল হক	”
০৭	” কহিনুর (১)	২২	”	” ওবায়দুল	”
০৮	” আছিমা	৫০	”	” আফাজ উদ্দিন	”
০৯	” লাভলী	২৫	”	” হাফিজ উদ্দিন	”
১০	” রওশোনারা	৩৫	”	” আফাজ আলী	”
১১	” কাজলী	২০	”	” সাইফুল	”
১২	” রহিমোন	৪৫	”	” মাহাম্মদ	”
১৩	” আনোয়ারা (১)	৩৫	”	” মহুবার	”
১৪	” আনোয়ারা (২)	৫০	”	” জোব্বার	”
১৫	” আনোয়ারা (৩)	৩৮	”	” জলিল	”
১৬	” রমিচা	২২	”	” আনার্ল	”
১৭	” লতিফোন	৪৫	”	” ছকিম উদ্দিন	”
১৮	” ফেন্সি	২৭	”	” শফিকুল	”
১৯	” আঞ্জুরা	২৫	”	” জহুর্ল	”
২০	” সুফিয়া	৪০	”	” আনছার	”
২১	” আলিয়া	৪০	”	” ছানার	”
২২	” ছকিনা	৪৫	”	” রকমান	”
২৩	” রাবেয়া	৫০	”	” মোবার	”
২৪	” ছালেহা	৪০	”	” খয়রদ্দিন	”
২৫	” মালেকা	৫৫	”	” নুর ইসলাম	”
২৬	” রেজিয়া	৩৫	”	” ছলেমান আলী	”
২৭	” খালেদা	২৪	”	” মমতাজ	”
২৮	” মহছেনা	২৮	”	” রহমান আলী	”
২৯	” কহিনুর (১)	২৪	”	” আশরাফ	”
৩০	” মাহামুদা	৩০	”	” মহাতাব	”
৩১	” খাদিজা	৩০	”	” একরামুল হক	”
৩২	” রোকেয়া	৩১	”	” জামাত আলী	”
৩৩	” শরিফা	২৫	”	” আহছানুল হক	”
৩৪	” আছাতোন	৪৫	”	” আফছার আলী	”
৩৫	” রেজিয়া	৩৫	”	” নবীজার রহমান	”
৩৬	” মরিয়ম	২২	”	” মিজানুর রহমান	”
৩৭	” নৈজ্জাতোন	৩৫	,,	” ছানার আলী	,,
৩৮	” রাশেদা	১৮	”	” জহুর্ল ইসলাম	,,
৩৯	” রওশনারা	৩৫	”	” সৈয়দ আলী	,,
৪০	” অমিছা	৩৮	”	” ছলেমান আলী	,,
৪১	” আরজিনা	২৪	”	” মিজানুর রহমান	,,
৪২	” জোলেখা	৩৫	”	” জিকুর্ল হক	,,
৪৩	” আরজিনা	২৫	চাকুরী	” আনিছুর রহমান	,,
৪৪	” ছায়রা বানু	২২	গৃহিনী	” আব্দুল মাজিদ	,,
৪৫	” আছমা বেগম	৩০	”	” মন্ড্রজ আলী	,,
৪৬	” আলেয়া	৩৫	”	” আজিজুল হক	,,
৪৭	” মাজেদা	৩৫	”	” আলীম উদ্দিন	,,
৪৮	” মমেনা	৫০	”	মৃত্যু আলী মামুদ	,,
৪৯	” আহিমা	৫৫	”	” আফাজ উদ্দিন	,,

৫০	” মিসু	৩৫	”	” মফিজার রহমান	,,
৫১	” মিনু	২৫	”	” হেলাল উদ্দিন	,,
৫২	” মোছলেমা	৩৫	”	মৃত্যু আতিয়ার রহমান	,,

কেন্দ্রভিত্তিক গবেষকদের নাম ও ঠিকানা। স্থানঃ ডাঙ্গাপাড়া, কাঠালী ইউনিয়ন

ক্রমিক নং	গবেষকের নাম	বয়স	পেশা	স্বামীর নাম	গ্রাম
০১	মোছাঃ লিপি আকতার	৩০	গৃহিনী	” আব্দুর রউফ	ডাঙ্গাপাড়া
০২	” সাহিদা বেগম	৩০	”	” মকবুল হোসেন	”
০৩	” ফয়াজান বেগম	৫০	”	” বদিউদ্দিন	”
০৪	” আরজিনা বেগম	৪০	”	” রশিদুল	”
০৫	” রাশেদা বেগম	৩৫	”	” আলিম উদ্দিন	”
০৬	” জেসমিন আকতার	৩০	”	” কাশেম আলী	”
০৭	” জবেদা বেগম	৪০	”	” ফজলা মামুদ	”
০৮	” রূপালী বেগম	২২	”	” হাছিনুর রহমান	”
০৯	” লাইলী বেগম	৩০	”	” হাফিজুল ইসলাম	”
১০	” ফেরোজা বেগম	২৫	”	” হাবিবুর রহমান	”
১১	” ফতেমা বেগম	৪৫	”	পিতাঃ বদিউদ্দিন	”
১২	” অফিজোন	৫০	”	” সমসের আলী	”
১৩	” আলেফজোন	৫০	”	” দেলবর	”
১৪	” মোর্শেদা বেগম	২২	”	” হোসেন আলী	”
১৫	” রাবিয়া বেগম	৩৫	”	” সাহিনুর রহমান	”
১৬	” রিনা আকতার	২০	”	” মজিবর	”
১৭	” কছিমোন	৫০	”	” দেলবর	”
১৮	” নারজু বেগম	২৫	”	” বুলু মিয়া	”
১৯	” নার্গিস আকতার	২০	”	” জিয়ার ল	”
২০	” বেগম	৪০	”	” বেলাল	”
২১	” বুলবুলি	৪০	”	” মনতাজ	”
২২	” হাজেরা বেগম	৫০	”	” মনছুর আলী	”
২৩	” লাইলী বেগম	৫০	”	” রহিম উদ্দিন	”
২৪	” রূপালী বেগম	২০	”	” খালকে	”
২৫	” মেরিনা বেগম	২৫	”	” সহরাব আলী	দেশীবাই
২৬	” ছালেহা বেগম	৫০	”	” আছাদ্দিন	”
২৭	” স্বপ্না বেগম	৩০	”	” সাপিয়ারা রহমান	”
২৮	” বিলকিস	২০	”	” আমিনুর রহমান	”
২৯	” ফেরোজা বেগম	৩০	”	” আফিয়ার রহমান	”
৩০	” আতোয়ারা	২৫	”	” হাফিজুর রহমান	”
৩১	” সাহিদা বেগম	৫০	”	” দেলাবর রহমান	”
৩২	” রওশনারা বেগম	৩০	”	” নজর ল ইসলাম	”
৩৩	” তরছিনা বেগম	৩০	”	” মতিন	”
৩৪	” সাহিদা বেগম	৪০	”	” আফাজউদ্দিন	”
৩৫	” নুরজাহান বেগম	৫৫	”	” জবান আলী	”
৩৬	” ফরিজোন বেগম	৪০	”	” কালটু মামুদ	”
৩৭	” আরজিনা বেগম	২৫	”	” রাজু মিয়া	”

কেন্দ্রভিত্তিক গবেষকদের নাম ও ঠিকানা। স্থানঃ করলাবেচাটারী, খুটামারা ইউনিয়ন

ক্রমিক নং	গবেষকের নাম	বয়স	পেশা	স্বামীর নাম	গ্রাম
০১	মোছাঃ আয়মেনা	৩০	গৃহিনী	মোঃ সামসুল হক	পশ্চিম খুটামারা
০২	” হোমেয়ারা বেগম	২৫	”	” রফিকুল	”
০৩	” মাজেদা	২০	”	” সপিয়ার	”
০৪	” মিনুয়ারা	৩০	”	” আজিজুল হক	”
০৫	” খতেজা	৪৫	”	” মোসলেম	”
০৬	” হাস্না বেগম	৫০	”	” মোবারক	”

০৭	” জমিলা	৩৫	”	” তাহের উদ্দিন	”
০৮	” জরিনা	৪০	”	” আমিনুর	”
০৯	” রূপালি	২০	”	” হাশেম	”
১০	” লাকী	১৬	”	” হামিদুল	”
১১	” রাবিয়া	৫০	”	” মতিয়ার	”
১২	” রহিম	২৫	”	” তছলে	”
১৩	” সামছুরনাহার	১৭	”	” নুর আলম	”
১৪	” জামিলা	৫৫	”	মৃতু রহমান	”
১৫	” মেরিনা	৩০	”	” আমিনুর রহমান	”
১৬	” মোর্শেদা	২৫	”	” ছামিদুল	”
১৭	” আনোয়ারা	৩৫	”	” মহমুদ্দিন	”
১৮	” আনো	৪০	”	” মমিনুর	”
১৯	” মহমিনা	২০	”	” লোবাউদ্দিন	”
২০	” বেগম	৩৫	”	” আজিজুল	”
২১	” ফতেমা	২০	”	” মমিনুর	”
২২	” জোস্না (১)	৩০	”	” আছিমুদ্দিন	”
২৩	” জোস্না (২)	৩০	”	” মহির উদ্দিন	”
২৪	” জোস্না (৩)	২৫	”	” খালেক হোসেন	”
২৫	” তবজিলা বেগম	২৫	”	” আনার	”
২৬	” ফজিলা বেগম	৫০	”	মৃতু মনির উদ্দিন	”
২৭	” মহিলা বেগম	৪৫	”	” রশিদুল ইসলাম	”
২৮	” অজিফা	৪৫	”	” আহাদ আলী	”
২৯	” তবছোনন্নাহার	৪০	”	পিতাঃ মোসলেম	”
৩০	” শেফালী বেগম	১৫	”	স্বামী- মমিনুর রহমান	”
৩১	” ইতিনা বেগম			”	”

কেন্দ্রভিত্তিক গবেষকদের নাম ও ঠিকানা। স্থান ঃ পূর্ব ডাঙ্গাপাড়া, কাঠালী ইউনিয়ন

ক্রমিক নং	গবেষকের নাম	বয়স	পেশা	স্বামীর নাম	গ্রাম
০১	মোছাঃ হামিদা বেগম	৪০	গৃহিনী	মোঃ সামছদ্দিন	পূর্ব ডাঙ্গা পাড়া
০২	” মাজেদা বেগম	৩০	”	” আবুল	”
০৩	” শরিফা বেগম	২০	”	” জিয়ার ল	”
০৪	” মজিনা বেগম	৪০	”	” মমিনুর রহমান	”
০৫	” ধৌলি বেগম	৪০	”	” আহাদ আলী	”
০৬	” জোস্না বেগম	৫০	”	” ওসমান আলী	”
০৭	” তহমিনা বেগম	২৫	”	” সামাদ আলী	”
০৮	” সেলিনা বেগম	১৫	”	” মোকছেদুল	পঃ খুটামারা
০৯	” আরজিনা বেগম	৩০	”	” আতিয়ার	ডাঙ্গাপাড়া
১০	” মহিলা বেগম	৩৫	”	” রশিদুল	খুটামার
১১	” মমেনা বেগম	৩৫	”	” ছোবাহান	ডাঙ্গাপাড়া
১২	” আলেফজোন	৪৫	”	” হামেদাল- ী	খুটামারা
১৩	” শেফালী বেগম	১৮	”	” নজু মিয়া	”
১৪	” পারভীন বেগম	১৮	”	” জহুর ল ইসলাম	”
১৫	” নুরবানু বেগম	২৫	”	” রফিকুল আসলাম	”
১৬	” নালো বেগম	৫০	”	” আজিম উদ্দিন	দেশিবাই
১৭	” রওশনারা বেগম	২২	”	” হানিফ	”
১৮	” মহিতোন বেগম	৩০	”	” বয়েজ উদ্দিন	খুটামার
১৯	” শিল্পি বেগম	২২	”	” তাহজ উদ্দিন	”
২০	” নুরন্নাহার বেগম	৩৫	”	” মোফাজ্জল	”
২১	” আহিমা বেগম	২৫	”	” এয়াকুব আলী	”

২২	” রাবেয়া বেগম	৩০	”	” আতিয়ার রহমান	”
২৩	” বেবি আকতার	৩০	”	” তোজাম	”
২৪	” মরিয়ম	৩০	”	” মমতাজ	”
২৫	” জরিনা বেগম	৪০	”	” সৈয়দ আলী	পশ্চিম খুটামারা
২৬	” শরিফা বেগম	২৫	”	” গুলজার আলী	”
২৭	” আমেনা বেগম	৩০	”	”	”
২৮	” হামিদা বেগম	৪০	”	সামসুদ্দিন	দেশিবাই
২৯	” সাহেরা (১)	২৫	”	” মজিবর রহমান	”
৩০	” সাহেরা (২)	৩০	”	” নজর ল ইসলাম	পশ্চিম খুটামারা
৩১	” মোতাহারা	৩৫	”	” আবাজ আলী	দেশিবাই
৩২	” মহেছেনা বেগম	২৫	”	” মজিদুল হক	পশ্চিম খুটামারা
৩৩	” তনুকা বেগম	২৫	”	” আবুল হোসেন	”
৩৪	” ছাপিযা বেগম	৪০	”	” মমতাজ উদ্দিন	”
৩৫	” সামিনা বেগম	৩৫	”	” মোকলেছার রহমান	”
৩৬	” আঞ্জুয়ারা বেগম	৪৫	”	” আমিনুর রহমান	দেশিবাই
৩৭	” মালা	৩৫	”	মোঃ ছলেমান আলী	পঃ খুটামারা
৩৮	” নুন্নাহার বেগম	৩০	”	” আনোয়ার হোসেন	”
৩৯	” সুরাইয়া	২২	”	” ওয়াহিদুল হক	”
৪০	” তপুরা	৪০	”	” আশরাফ আলী	”
৪১	” নৈজ্জাতোন	৫০	”	” আফাজ উদ্দিন	”
৪২	” মোছলেমা	৪০	”	” ইয়াকুব আলী	”
৪৩	” আরজিনা	২২	”	” পোয়ার ল কহ	”
৪৪	” মমেনা	৪০	”	” কবিল হোসেন	”
৪৫	” জোস্না	৪০	”	” তমিজ উদ্দিন	”
৪৬	” জাহেদা	৪০	”	” মজিবর রহমান	”
৪৭	” রূপালী	২৫	”	” জিকুর ল হক	”
৪৮	” জোস্না	২৫	”	” জামাত আলী	”
৪৯	নিলুফা			” সমছের আলী	”

দলগতভাবে বসে পুর ষরা গবেষণায় অংশগ্রহণ করেননি। ব্যক্তিগতভাবে ও কয়েকজন মিলে যাদের সাথে কথা বলা হয়েছে বা মতামত দিয়েছেন তাদের নাম, ঠিকানা নীচে উপস্থাপন করা হলো।

ক্রমিক	নাম	বয়স	পাড়া
১	সহিদুল ইসলাম	১৮	ডাঙ্গাপাড়া
২	মজিবর রহমান	২২	”
৩	র বেল	২৬	”
৪	জনাবউদ্দিন	৫৫	জুম্মাপাড়া
৫	জাহাঙ্গীর আলম	২১	ডাঙ্গাপাড়া
৬	মজবুল ইসলাম	১৮	”
৭	আবু সুফিয়ান	৩৫	করলাবেচাটারী
৮	হাফিজুর রহমান	৩০	ডাঙ্গাপাড়া
৯	হাবিবুর বরমান	৩২	”
১০	নুর ইসলাম	২০	জুম্মাপাড়া
১১	সবুজ	২২	ডাঙ্গাপাড়া
১২	ফেরদৌস	২৩	”
১৩	আনিচুর রহমান	২৩	ভরসাপাড়া
১৪	আঃ লতিফ	৪৫	হাজীপাড়া
১৫	আশরাফ আলী	৩২	করলাবেচাটারী
১৬	গোলাম মোস্তফা	৩৫	ডাঙ্গাপাড়া
১৭	আঃ রউফ	২৫	”
১৮	রহিমুদ্দিন	৬০	”
১৯	আনিচুর রহমান	২৫	করলাবেচাটারী

২০	অহিদুল	৪০	”
২১	ইমদাদুল	২৫	”
২২	আঃ জলিল	৩২	”
২৩	মংলু মাহমুদ	৩৬	”
২৪	ফরিদউদ্দিন	২৮	”
২৫	হেলালউদ্দিন	১৭	”
২৬	মোসফিউদ্দিন	১৫	ডাঙ্গাপাড়া
২৭	সফিয়ার রহমান	৩৫	”

ডাঙ্গাপাড়া ও করলাবেচাটারীর দুটি শিশু গবেষণা কেন্দ্রের তথ্য শিশু গবেষকদের নাম ঠিকানা নীচের টেবিলে উপস্থাপন করা হলো

ক্রমিক নং	শিশুর নাম	বয়স	মাতার নাম	ইউনিয়ন
০১	মোছাঃ কাকুলী আক্তার	৫	মোছাঃ সেরিনা বেগম	খুটামারা
০২	” আয়শা সিদ্দিকা	৪	” আরজিনা বেগম	”
০৩	” শান্ড় ইসলাম	৫	” বানু আক্তার	”
০৪	” শাহেল আক্তার	৫	” অজিফা বেগম	”
০৫	মোঃ আদেশ আলী	৫	” আনোয়ারা	”
০৬	” সুজন ইসলাম	৪	” সুফিয়া বানু	”
০৭	” মনিবুর রহমান	৪	” মরিয়ম	”
০৮	” ফেরদুছ আলম	৪	” ফেন্সি	”
০৯	” আসিদ রানা	৫	” আসেদা বানু	”
১০	” আসেদ রহমান	৪	” আসিদা	”
১১	মোছাঃ জনি আক্তার	৪	” আনোয়ারা	”
১২	” নিলি আক্তার	৫	” মিসুয়ারা	”
১৩	” নুজ্জাহান আক্তার	৪	” রাজিয়া	”
১৪	” রিতা আক্তার	৪	” শরিফা	”
১৫	” রউফা আক্তার	৫	” বুলবুলি	”
১৬	মোঃ গোলাম রাব্বানী	৫	” ওহিমন	”
১৭	মোছাঃ লাকী আক্তার	৪	” রোকেয়া বেগম	”
১৮	” আদুরী বেগম	৫	” হিলালী বেগম	”
১৯	” জাকিয়া আক্তার	৫	” আনোয়ারা	”
২০	” আসরীকা	৪	” আলিয়া	”
২১	” সীমু আক্তার	৪	” আসনারা	”
২২	” রীমা মনি	৫	” রওশনারা	”
২৩	মোঃ আরিফুল হক	৫৪	” আঞ্জুয়ারা	”
২৪	” এনিফুল হক	৪	” এনিফা বানু	”
২৫	মোছাঃ আখি মনি	৪	” অজিফা	”
২৬	” হাবিরা আক্তার	৪	” মর্ফা বানু	”
২৭	মোঃ সাকিব রহমান	৫	” শরিফা বানু	”
২৮	” যাদু মিয়া	৪	” সামিনা	”
২৯	” ফুল মিয়া	৪	” রোকেযা বানু	”
৩০	আর্নিকা আক্তার	৫	” ওমিছা বানু	”

ডাঙ্গাপাড়া শিশু গবেষণা কেন্দ্র

ক্রমিক নং	শিশুর নাম	বয়স	মাতার নাম	ইউনিয়ন
১	মোছাঃ দুলালী বেগম		মোছাঃ আতোয়ারা	কাঠালী
২	” হাবিবা		” ফেরোজা	”
৩	” খাদিজা		” রবিয়া	”
৪	মোঃ এখলাজ		” আরজিনা	”
৫	মোঃ রিয়াদ		” মোর্শেদা	”
৬	” শুজল		” মোশেয়া	”
৭	” মোন্নাত		” মোর্শেদা	”
৮	মোছাঃ আলিফনুর		” লাইলী	”
৯	'মোঃ সুমন		” সুমিসা	”
১০	” মোখলেছ		” আরজিনা	”
১১	” নুন্না		” অমেনা	”
১২	মোছাঃ সুহাগী		” মেরিনা	”
১৩	” ধওলী		” জরিনা	”
১৪	” লিখা		” আমেনা	”
১৫	মোঃ মাজমুল		” লাইজ	”
১৬	মোছাঃ আদরী		” জিচি	”
১৭	” র ”বিনা		” হাসিনা	”
১৮	”মজুনু		” মঞ্জু	”
১৯	মোঃ ওজিদুল		” ওজিফা	”
২০	'মোছাঃ তাহুরা		” মোর্শেদা	”
২১	”ছামিনা		মেরিনা	”
২২	” সোনালী		” আনোয়ারা	”
২৩	” রিক্তা		” কুলসুম	”
২৪	মোঃ সুজন		” খতিজা	”
২৫	মোছাঃ আইরিন		” ভুন্দি	”
২৬	” আরফিন		” মোর্শেদা	”
২৭	” আয়শা		আরজিনা	”
২৮	” জিচি		মনোয়ারা	”
২৯	” জিচি		” সকিনা	”
৩০	মোঃ আলামিন		” তকজিলা	”

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কৃতজ্ঞতা স্বীকার, ভূমিকা ও গবেষণার বিষয়	১
গবেষণার উদ্দেশ্য, এলাকা, সময়কাল, এনিমেটর নিয়োগ ও গবেষণার দল গঠন	২ – ৩
গবেষণার শুর ু	৩
কোন কোন জিনিস-পত্রের সাধারণত হয়ে থাকে	
মঙ্গার সময় কী পরিস্থিতি হয় ও কেমন করে তারা মঙ্গার মধ্যে টিকে থাকেন	৪ - ৫
মঙ্গার কারণসমূহ ও মঙ্গার কারণের বিশে- ষণ	৬ - ৯
শিশু গবেষণা কেন্দ্র ও স্বেচ্ছাসেবী এনিমেটর দল	৯ - ১০
গণগবেষণার ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠান	১০
উপসংহার	১১
সংযোজনী - ১ (কেস স্টাডি)	১২ - ১৪
মঙ্গা বিষয়ে গবেষকদের কিছু উক্তি	১৫
কেন্দ্রভিত্তিক গবেষকদের নাম, ঠিকানা	১৬ - ২০
শিশু গবেষকদের নাম, ঠিকানা	২০ - ২১

প্রকল্পঃ মঙ্গা প্রতিরোধে গণগবেষণা
জলঢাকা, নীলফামারী

চূড়ান্ড় প্রতিবেদন

সহযোগিতায়ঃ

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)

বাড়ী ১০৪, রোড ২৫, ব- ক এ, বনানী
ঢাকা।

গবেষণা সমন্বয়কারীঃ
আলাউদ্দিন আলী
বাড়ী ২৩৩, ডাকবাংলা সড়ক
নীলফামারী।
মোবাইলঃ ০১৭২-৮৭৮৩০০